KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৩/বি ঘোষ লেন, কলকাতা-৬
Collection : KLMLGK	Publisher : পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
Title : অনুযুগ	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 2	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৮৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অন্ধযুগ দ্বিতীয় সংকলন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ফতোয়া বা শমনের বিরুদ্ধে সাহিত্য রুখে দাঁড়ায় বলে প্লেটোর রাজ্যের বাসিন্দারা সাহিত্যিককে বন্দী, নির্বাসিত অথবা হত্যা করতে চান।

বুদ্ধদেব বসু

কথা ছিলো, বুদ্ধদেব বসুর অবিস্মরণীয়তার উদ্দেশে অন্ধযুগের পৃষ্ঠায়ও একটি শোকলিপি উৎকীর্ণ করা হবে। পুনর্বিবেচনায় মনে হলো, শোক প্রকাশের প্রথা যথাবিহিত পালন করে আমরা স্বনির্ভর নিশ্চিন্ততা পেতে পারি তবু বুদ্ধদেব বসুর আরো কিছু বেশী প্রাপ্য আছে। পথে ও বিপথে, দেশে ও প্রবাসে তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক, দুর্বহ হলেও গ্রহণ করতে হয়েছে আত্মবিনাশের কয়েকটি দায়। শুধু তাঁর সাহিত্যানুরাগ ছিলো অপরিত্যাজ্য, সাহিত্যকে গ্রহণ করে তিনি নিজের জীবনকেই গ্রহণ করেছিলেন। এমন কী, সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতি শেষাবধি মমত্বের মতো হয়ে উঠেছিল। শুধু মাত্র সাহিত্যব্রতকে অনাচ্ছন্নভাবে আয়ত্ত করবেন বলে যিনি কোনোদিন পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিদ্বান্ বা নেতা কোনোটাই হয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁর স্মৃতির ভজনা অশ্রুপাতে আর হাহাকারে শেষ হয়না—দায়িত্বমাত্র এড়ানো যায়। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক প্রতিভাধরদের একজন, যিনি বাংলা-সাহিত্যের ধারাটিকে চিরবহমান করে রাখতে চেয়েছেন। যদিও বিপরীত মানসিকতার দৃষ্টান্তই পর্যাপ্ত, এমন কী একথা স্বাভাবিক বলে মনে হয় যে, এদেশের সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের গতি রুদ্ধ করে, অন্ততঃ শ্লথ করেও, তৃপ্তি লাভ করেন। বুদ্ধদেব বসু সে' জাতীয় বঙ্গসন্তান ছিলেন না, যারা নাকি সাহিত্য রচনাকে মই হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। হয়ত' তাঁর রোমান্টিক ধ্যানধারণাগুলির কাছে একাগ্রে আত্মসমর্পণ কিংবা ঔপনিবেশিকদের ভাষাদর্শ গ্রহণের আড়ালে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের কিছু কলংক প্রচ্ছন্ন আছে, হয়ত' আসবাবের কবিদের প্রতি কম মনোযোগ দিলে তিনি নিজের ক্ষমতার পূর্ণতার প্রয়োগ করতে পারতেন : এই সব সংশয় পরীক্ষা করার সাথে সাথে এখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠুক।

একজন ঋষি ও বিলাসী আমরা

বাংলা সাহিত্য যদি কোনোদিন সত্যবাদী হয় তাহলে ৩০/৫০ বছর বাদে একটি কৃশকায় গ্রন্থের খোঁজ পড়বে, যার প্রণেতা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (অধুনা ডক্টরেট)। যিনি ঐ মন্তব্যটি কারণ, তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, বাংলা সাহিত্য যে আদৌ সত্যভাষী না-ও হতে পারে, এবং সেরকম না হলেও তা সাহিত্য হবে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আগে ছিলো না। সন্দীপনবাবু অন্ধযুগ প্রসঙ্গে জানান, যখন বাচ্চাদের টেক্সটবুকের কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কবিতার কাগজ করা স্রেফ বিলাসিতা। বরানগরে যেতে আমাদের বারো আনা খরচ হয়নি, কিংবা তাঁর বাড়িটি সিনেমা হল নয়, এমন বিবেচনায় আমরা হাততালি দিইনি। আমরা হিসেব করতে পারিনি, আড়াইশ কপিরকাগজ আমরা না কিনলে ক'টি টেক্সটবুক প্রকাশক উপকৃত হতেন, এবং যে দেশের টেক্সটবুকের কি সব যেন খ্যাতি আছে তার থেকে বাচ্চারা বঞ্চিত হলে কতোটা রসাতলে যেতে পারতো। আমরা কেবলমাত্র আঁচ করতে পেরেছিলাম, লেখালেখি বা সে সংক্রান্ত যে কোনো কাজই ভয়ংকর বিলাসিতা ; সে ধারণা সন্দীপনবাবু এভাবে সমর্থন করেছেন।

শ্রেষ্ঠ কবিতার কাব্যমীমাংসা

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গোছের শব্দ ব্যবহার হলে আমরা চমকে যেতাম না। আমাদের জানা ছিল যে বাঙালী পাঠকরা শ্রেষ্ঠ শুনতে পছন্দ করেন ; কোনো বইয়ের কভারে শ্রেষ্ঠ থাকলে তাঁরা বইটিকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকেন, বইয়ের টাইটেল পেজ-এ করুণভাবে লেখক যতোই ভণিতা করুন না কেন। পয়সার দরকার প্রকাশক ও লেখক উভয়েরই আছে, সুতরাং এ কুসংস্কার মেনে নিতে হয় নানা অবস্থায়। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না একে কেউ বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি আমরা জেনেছি, এ বিশ্বাস এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭৩ নামক সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম সম্পাদকের ভূমিকা থেকে আমরা কবিদের খারাপ ব্যবহারের বিষয়ে জানলাম। বেশ লাগলো। জানা গেলো, সম্পাদক দলহীন একলা মানুষ বলে কম-কবিতা-নেওয়া না নেওয়া কবিরা তাঁকে নানাভাবে স্নায়ুধ্বস্ত করেছেন। অনেকে তাঁর অধিকার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সম্ভবত এর জবাবেই সম্পাদক নিষ্ঠা, পাঠপরিশ্রম, জ্ঞান, শুদ্ধকবিতারচেতনা প্রসঙ্গ তুলেছেন। যিনি মোটামুটি একা থাকার সাহস দেখিয়েছেন, আমাদের ভাল লাগতো, তিনি যদি তাঁর এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গোত্থাপন না করতেন। সুদৃশ্য বইটি অনেকেই কিনবেন, কবিদের এমন আচরণ তাঁদের কাছে খুব শ্রদ্ধার দাঁড়াবে না। কবিতাপ্রেমিকতার জন্যেই অন্তত এসব প্রসঙ্গ ছাপার অক্ষরে আনা উচিত নয়। একটা মূল প্রশ্নের জবাবে তিনি মেনেও নিয়েছেন, সমস্ত সংকলনই ব্যক্তিগত, এবং রুচিশীল সম্পাদনা আরো বেশি ব্যক্তিগত। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন বারোয়ারী সংকলন নিয়ে—তার চরিত্রহীনতা নিয়ে, কেননা সেখানে কবিদের অবাধ নির্বাচন দায়িত্ব থাকে। আমরা প্রথম সম্পাদককে জানাতে চাই, একটি সংকলন প্রত্যেক বছরে বার হচ্ছে—সেটা আরো চরিত্রহীন, কেননা, কবিতার চেহারা না পাল্টালে সংকলন বার করার কোনো যুক্তি নেই, এবং তিনিই জানিয়েছেন সমসাময়িক নতুন অভিজ্ঞান কবিদের লেখায় নাকি নেই। মণীন্দ্রবাবু ধরে নিয়েছেন তাঁর জ্ঞান বুদ্ধির প্রতি আমাদের বা কবিদের অবিশ্বাস আছে। সেরকম কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু যখন তিনি দাবি করেছেন তিনি ভালো কবিতা বেছে

উলুখড়ের জন্য বিজ্ঞাপন

উলুখড়ে লিখুন। উলুখড় পড়ুন। ১৯৭৩-এর শ্রেষ্ঠকবিতায় এই পত্রিকায় প্রকাশিত শতকরা ৭০ টি কবিতা কমন আসিয়াছে

তুলেছেন, অনুগ্রহপূর্বক, প্রত্যেকটি কবিতার পাশাপাশি তাঁর বিচারপদ্ধতির প্রকাশ জরুরি—আমরা একটু বুঝি যে তিনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন, কিভাবে তাঁকে স্পর্শ করে অক্ষরসজ্জার এই বিচিত্র রীতিটি। তা না করে, কেবলমাত্র ভূমিকায় জ্ঞান বা শুদ্ধকবিতাচেতনা এসব কথা বললে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবো। যে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতাপ্রসূত গবেষণা তিনি চেয়েছেন তিনি তা নিজেই আরম্ভ করুন না! আপেক্ষিক রুচির উত্তর তুলে কয়েকজন মননশক্তিকে বিদায় জানিয়েছেন, মণীন্দ্রবাবুর এমন মনে হয়েছে। আমরা আবার নিবেদন করছি, জ্ঞানীরসিকের সঙ্গে কর্মীরসিকের পার্থক্যটাই অপক্ষপাতের সঙ্গে পক্ষপাতের। পাঠক বোদ্ধারসিক সকলকেই গ্রাহ্য করবেন, তা বলে, কবিরা করবেন না কবিতা লেখার পাশাপাশি কবিতা বোঝবার ও বোঝাবার যে চেষ্টা আছে সেটার সম্পর্কে নিজে কবিতা লেখেন না এমন

মানুষের কথা অনেক বেশি গ্রাহ্য, কিন্তু আমরা জানি যে মণীন্দ্র গুপ্ত নিজে একজন কবি। হয়তো ওই কারণেই তিনি 'উত্তরের কবি' এবং 'দক্ষিণের কবি' এমন অসতর্ক এবং অপমানকর কথা লিখতে পেরেছেন—কবিতা লেখেন না এমন কোনো মানুষ পারতেন কি!

দ্বিতীয় সম্পাদক অনেক যথার্থ কথা লিখেছেন, কিন্তু তিনিও কথঞ্চিৎ ডগম্যাটিক। তাঁদের সংকলনে কবিতা কবিতার নিজস্ব ক্ষমতায় এসেছে এ কথা তিনি অবশ্যই জানাতে পারেন, কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাঁদের ধারণাকে তার সঙ্গে রাখা উচিত ছিল। 'আমি মনে করি' এমন নীতি তো খুব যথেষ্ট নয়।

আরো দেখা গেলো, সাধ্যাতীত কারণে কারোর কারোর লেখা তাঁরা নিতে পারেননি। আমরা যতদূর জানি, নির্বাচিত দুজন কবির প্রশ্নে, সাধ্যাতীত অবস্থাটি ঘটেছিল। তাঁরা কাব্যবিচারে আপেক্ষিকতার প্রশ্ন করেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন, সংকলনটিকে তাঁদের মনোমত করে নেবার মতো নমনীয়তা দেওয়া হচ্ছে কিনা! পক্ষান্তরে এক রহস্যময় গোপনীয়তা পালন করা হয়েছিল। এখন কোদালকে কোদাল বলার আহ্বান, আমাদের সরস লাগে। এরপর চম্পূকাব্যলেখক যদি মহাকাব্য রচনার ডাক দেন, আমরা বিস্মিত হবো না। যে কাব্যবিচার বিপুলা পৃথিবী ও নিরবধি কালের কাছে অর্পিত, তাকে দুটি মেধা, 'তুমি আমাদের ভক্ষ্য হইবে' এমন আস্ফালন দেখালে কাব্যবিচার তিলোত্তমা হয়ে উঠবেন, সন্দেহ নেই। সাড়ে ছহাজার রচনা থেকে পৌনে দুশোটি **দাঁড়ানো** কবিতা, আমরা পড়লাম। কতকগুলি প্রিয় লেখা রয়েছে, কতকগুলি গ্রাহ্যের বাইরে। আমাদের ভাল লেগেছিল এমন লেখাগুলো 'দাঁড়িয়েছে' কিনা আমরা লক্ষ্য করিনি—গ্রন্থটি পেঁয়ে বোঝা গেল দাঁড়ায়নি, যেমন শক্তি, শঙ্খ, অলোকরঞ্জনের নামছে মেঘ, পাগল হবার আগে, গিলোটিনে আলপনা নাম্নী পদ্যগুলি—তারা এ সংকলনে নেই। শঙ্খ বাবুর উক্ত লেখাটি বিশেষভাবে আলাদা, এই লেখাই তাঁর এতোদিনের পরিচিত শব্দশারণ্যকে ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সম্পাদকের চোখে নিশ্চয় আমাদের জ্ঞান ভাসা ভাসা। আমরা একবারও বলছি না, ওই সংকলনের সম্পাদকদ্বয় হীনবুদ্ধি, বা কপট, শুধু বলছি, তাঁরা তাঁদের রুচিমতো বা একটি মনোমতো সংকলন প্রকাশ করেছেন, যার অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে কিন্তু যখন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তাঁরা জানাচ্ছেন তখন বর্জিত **না দাঁড়ানো** কবিতারাশি কেন **দাঁড়ায়** নি, এর একটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার দরকার ছিলো। কেননা, এঁরাই বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার প্রয়োজন অনুভব করছেন। হায়, পৃথিবীর শেষতম ঋষিটি কেন যে সোশ্যালিজম কথাটার আগে সায়েনটিফিক বসিয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দে তাই আমাদের বড়ো প্রীতি জন্মিল। এঁরা দাবি করছেন, শিক্ষা অভিজ্ঞতা সংবেদনশীলতার, কিন্তু শিক্ষাই সম্ভবত বিপরীত রুচির সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। উত্তরের কবি, দক্ষিণের কবি, বর্জিত সহযাত্রী, দ্বিধাহীনভাবে **না দাঁড়ানো কবিতা** বলা যে কি বোঝায়, আমরা জানিনা। একটি সংকলন নিশ্চয়ই কোনো রাজ্যশাসন নয়, অথচ এঁরাই প্রায় পলিটব্যুরো সিক্রেসি রেখেছিলেন। কবিকে, মধ্যযুগীয় সূত্রধার যেমন নটকে ব্যবহার করতেন, সে ভাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কোনো সম্পাদকের যেমন অধিকার আছে মনোমত সংকলন করার, তেমন নির্বাচিত কবিরও অধিকার আছে, যে সংকলনে তিনি সহযোগিতা করছেন, সেটি মনোমতো হচ্ছে কি না জানার। এ ব্যাপারটা ততো গুরুত্বপূর্ণ লাগেনি সম্পাদকদের।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা লেখক প্রবন্ধে বলেছিলেন, **লেখার সহিত যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, 'নিতান্ত ছেলে খেলা' করিয়া গেলেও তাহা 'প্রথম শ্রেণী'র ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।** অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং হেমন্ত আঢ্যের চূর্ণ কবিতা যখন বিচূর্ণ অবস্থায় ছাপা হয়, তখন আমরা নির্বিরোধ ব্যাপারটি কি বুঝে উঠতে পারি, কিন্তু আপেক্ষিক রুচির ওজর তোলা কবিতা লেখকরা সবাই কি আর ততোদূর নির্বিরোধ, সম্পাদকমশাই। অন্য লেখকদের প্রতিবেশিত্বের গুরুত্ব বিষয়ে যিনি সম্পাদককে অবহিত করেছিলেন, তাঁকে এঁদের কেউ জানান, 'আপনি এমন করবেন না। যারা বাদ পড়েছেন, পরের বছরেই তাঁরা চলে আসবেন।' যে লেখক এ হেন উৎকোচে রাজি হননি। আমরা জানি, আমরা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করছি, এবং সে অধিকার আমাদের মণীন্দ্রবাবুর ভূমিকাটিই দিয়েছে। এরপরও অ্যানার্কিজমের কথা বলেছেন তাঁরা, শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই, কোনো পরিষ্কার প্রশ্নের সামনে এলেই রক্ষণশীলরা আর

আত্মপ্রসন্নরা বিপরীতপন্থীদের "এনার্কিষ্ট" বলে, নিজেরা টোটালিটারিয়ান হয়ে যেতে ভালোবাসেন। যেমন যীশুও ছিলেন এনার্কিষ্ট, আর তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি

পশ্চিমবাংলার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্ররা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে শক্তি চক্রবর্তী, আলোক বাগচী, শম্ভু ঘোষ, প্রণবরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক দাশগুপ্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ দত্ত, সুভাষ ভট্টাচার্য, তরুণ ভট্টাচার্য এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর কবিতাকর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমরেশ বসুর 'তিনপুরুষ ও কয়েকটি কবিতা'র নামও তাঁরা করেছেন। আমরা যারা অল্পস্বল্প পদ্যটদ্য পড়ে থাকি, এই সব কবিদের সর্বসমক্ষে আবির্ভূত হতে অনুরোধ করছি—আমরা এঁদের চিনি না এ কারণে নয়, নাম শুনেই মনে হচ্ছে এঁরা নিশ্চয় 'আরো ভালো' লিখবেন।

এরা তোমায় খারাপ করে দেবে

আমাদের এক বিপ্লববিশ্বাসিনী বান্ধবীর বাড়িতে অন্ধযুগ পৌঁছোয়। মেয়েকে জন্মদিনে লেনিনগ্রন্থাবলী দেওয়া অভিভাবকরা সেটি পড়ে তাকে জানান, "এদের সঙ্গে মেশো নাকি" 'হ্যাঁ' 'ছি ছি, এসব অশ্লীল লেখা' 'আগে বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশতাম তখনও বারণ করেছিলে, এখন কবিদের সঙ্গেও মিশতে বারণ করছো' 'না না, সে কথা নয়। এদের লেখা পড়ে কি বুঝছো না এরা তোমায় খারাপ করে দেবে?'

এ ঘটনা জেনে আমরা সুখী। একটু গর্বও বোধ হলো—দুহাজারী চাকরির মার্কসবাদীরা এরকম বললেই বোঝা যায়, আমরা ঠিকই লিখছি।

শান্তিকুমার ঘোষ

কৃত্তিবাস সম্পর্কে একটি ভিন্নমত

বাংলা কবিতার বিবর্তনে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার অবদান সম্পর্কে আলাদা-ভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে 'অন্ধযুগে'র আবির্ভাব সংখ্যায়। 'কৃত্তিবাসে'র ঘনিষ্ঠ দুজনের ভাষ্য এবং 'অন্ধযুগে'র সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ প'ড়ে পাঠকের এমন ধারণা হ'তেও পারে যে, কৃতিত্ব দাবী করা হল এবং সে-দাবীকে (রোমাঞ্চকর উত্তেজনা বিনাই) বিচার বিবেচনা তো করা গেল কিন্তু তর্কের মীমাংসা হ'ল কই।

'তরুণ কবিদের স্বতন্ত্র চিহ্নের জন্য তখন কৃত্তিবাসের খুবই প্রয়োজন ছিল।' 'কৃত্তিবাসে'র সপ্তদশ (আশ্বিন ১৩৭০) সংকলনে সম্পাদকের মন্তব্য থেকে অন্তত একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, তখন কলকাতা শহরে 'কবিতা', 'সাহিত্যপত্র' প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এক দল কবিকে আলাদা মুখপত্র তৈরী ক'রে নিতে হয়েছে। অর্থাৎ 'কবিতা'-প্রমুখ পত্রিকার বর্ষীয়ান সম্পাদকরা সুবিচার করছিলেন না নবীনদের রচনার উপর: হয়তো নতুন কবিতা বুঝে ওঠা প্রবীণ সম্পাদকদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না।

এই অনুমান ঠিক হ'লে স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে 'কৃত্তিবাস'কে কেন্দ্র ক'রে যে গোষ্ঠী গড়ে উঠলো তার কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে কি। এতদিনে বাংলা কাব্যে যে ঐতিহ্য, সৌন্দর্যবোধ ও মনোভঙ্গী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার বিরুদ্ধে ঐ কবিরা সমর্থ কিছু কি দাঁড় করাতে পেরেছিল? যদি বলা হয় যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ, অকপট স্বীকারোক্তি বা অবিকৃত আত্মকথন, এমন কি চেতনাপ্রবাহের অনুসরণ নব্য কবিতার চরিত্রলক্ষণ তাহলে খটকা ওঠে যে, আগেকার কাব্যসাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য কি একান্ত অনুপস্থিত? পাঠককে বলে দিতে হবে না যে, ঐ রীতির একাধিক উদাহরণ আজকে ক্লাসিক বলে গণ্য হ'তে চলেছে:

১. "আমার দুচোখ অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎ স্মৃতি শ্রুতি
তোমার উলঙ্গ রূপ তাই দেখি রোজ
তুমি তো দেখনি দেশ অনাহার কাকে বলে"
(টাইরেসিয়স: বিষ্ণু দে)

২. "আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়,
আমি তারে পারি না এড়াতে"
(বোধ : জীবনানন্দ দাশ)

'পৃথিবীর শেষ কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে—একথা যদি সত্যি নাও হয়, তবে শেষ পৃথিবীর কিছু কবিতা এখন দ্রুত লেখা হচ্ছে—একথাই হয়তো সত্যি"—২২ নম্বর সংকলনে সম্পাদকের উক্তি। সম্ভবত 'শেষ কিছু কবিতা' লেখা যায় যে সময় কবিরা সংকটের মুখোমুখি—যখন তাদের অন্তঃশীল প্রবাহ বা উৎস শুকিয়ে যেতে থাকে। আর 'শেষ পৃথিবীর কিছু কবিতা' লেখা হয় যখন বিশ্ব সর্বনাশের সম্মুখীন এবং সেই সমষ্টিগত সংকট বোধ কবিদের মনে ও রচনাকর্মে স্বতই সঞ্চারিত হবে। যেমন, বিশ্বব্যাপী এক ক্রান্তিকালের কথা বলেছেন জীবনানন্দ। অথবা নৈরাশ্য, অবক্ষয় ও ব্যর্থতাবোধকে ভাষা দিয়েছেন সমর সেন। সে তুলনায়, 'কৃত্তিবাসে'র কবিরা সংকট সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও উপরিতলেই আবদ্ধ ছিল। সম্ভবত তারা পদ্মভুক নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের কবিকর্ম শীতল, অগভীর ও খণ্ডিত। সব চেয়ে বেশী কিছু যদি বলা যায় তা হচ্ছে, এই বিমূঢ় ক'রে দেবার মতো সময়ে তারা কবিতা রচনায় প্রবলভাবে আস্থাবান—কবিতা লেখা হ'ল ক্রমশ ভয়ানক হয়ে ওঠা পরিস্থিতিতে তাদের অতিদাহ্য অস্তিত্বে একমাত্র অভিব্যক্তি।

২৬ নম্বর সংকলনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছে : "কোনো মহান উদ্দেশ্য সাধন, এমন কি সৌন্দর্য সৃষ্টিও এই কবিতার লক্ষ্য নয়···এই প্রথম বাংলায় প্রচলিত হলো কাব্যাদর্শহীন কাব্য···।" দাবী করা হয়েছে যে, আলাদা কোনো সাহিত্যবাদ না চাপিয়ে কৃত্তিবাসের কবিরা আন্দোলন করেছে। "মুখোস খুলে রেখে বা নৈর্ব্যক্তিকতা সরিয়ে রেখে কবিতায় শুধু নিজের জীবনের কথা প্রকাশিত হবে।" কিন্তু কবি যেভাবে জীবন কাটায় শুধু সোজাসুজি ও সরলভাবে ব্যক্ত করাই কি কবিতার আবহমান ধারা নয়? আপাত ঘটনাবলীতে নির্লিপ্ত বা নিরাসক্ত হ'য়ে ন্যূন আবেগের সঙ্গে কবি যে সহজ ও অকপটভাবে বলে যাবে তার কথা সেটাই তো আধুনিকতা।

"বাংলা কবিতায় কৃত্তিবাস নিশ্চিত এক প্রকার রূপান্তর সূচনা করেছে" —২৫ নম্বর সংখ্যায় ঘোষণা করছে সম্পাদক। 'রূপান্তর' বলতে এখানে কোনো নীতি-না-মানা নিশ্চয় বোঝানো হচ্ছে না। কাব্যসাহিত্যে সুনীতি-কুনীতির যে কোনো বালাই নেই একথা একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের, ধরা যাক্, 'বিজয়িনী' কবিতা, জীবনানন্দের "করুণ শংখের মতো স্তন—দুধে আদ্র"···ইত্যাদি কিম্বা "অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর···মিশে থাকতে চেয়েছি"-র মতো পংক্তির প্রকাশ বাংলা কবিতাকে আগেই সাবালক করে দিয়েছে। নগ্ন সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ শিল্পী মাত্রেরই। এবং আদি রস নব রসের অন্যতম। কোনো কিছু যখন নিষিদ্ধ রইলো না সে সময় নিছক বিষয় মাহাত্ম্যে কি অভিনবত্ব করা যায়?

নতুন চরিত্রের হদিস মিলবে ব্যক্তিগত লিখনগঙ্গীতে। 'কৃত্তিবাসে'র মধ্যে অন্তত কয়েকজনের রচনায় স্বতন্ত্র বাক্-রীতি দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু কাব্য-সৃষ্টিতে স্বকীয়তাই কি একমাত্র গুণ?

১. "যখন দু-থাক্ শরীর হচ্ছে উপুর্যুপুর"
২. "কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে"
৩. "আমি তারই মুখ আধোজাগরূক ছাতাপাথরের
মতো মেলে ধরছি মুছে নিচ্ছি শ্যাওলা ও চোখের জলের দাগ"

নিছক স্বাতন্ত্র্যের চাইতে, প্রাঞ্জলতা সুমিতি ও অনুকম্পা পাঠককে টানে। প্রভাবহীন হলেই উৎকৃষ্ট কবিতা লেখা যায় না। আবার, প্রভাবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য রচনা সম্ভব। বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে পারলেও, 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠী কি পরবর্তী কালের কবিদের আদৌ প্রভাবিত করতে পেরেছে?

যখন বাণিজ্য সফল বৃহৎ পত্রিকাগুলি একচেটিয়া মূলধনের জোরে ক্রমাগত রুচির বিকার ও মানের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে, সে সময় 'কৃত্তিবাস' সত্যিকার উদ্ভাবনা প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি তুলে ধরতে পেরেছে কি? যথার্থ কবিতা সনাক্ত করতে তা কি সাহায্য করেছে? 'কৃত্তিবাসে'র ২৬ সংকলনে নবীন সম্পাদকের সাক্ষ্য এদিক থেকে প্রাসঙ্গিক। সে লিখছে : "এবার যে সব কবিতা ছাপা হল তার মধ্যে একটি কি দুটি বাদ দিয়ে সেগুলো যথার্থ কবিতা বা কবিতার নিম্নতম মান উত্তীর্ণ করতে পেরেছে কিনা আমার পক্ষে

সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা কঠিন হলেও এটা ঠিক যে আশানুরূপ কিছুই হল না।"

স্তিমিত-হ'য়ে-আসা বাংলা কবিতাকে চমক দিয়ে জীইয়ে তোলা ছিল 'কৃত্তিবাসে'র উদ্দেশ্য। ঐ পত্রিকাকে ঘিরে কয়েকজন উৎকেন্দ্রিক পদ্যকারের যূথচারিতা বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনে খানিকটা উত্তেজনা এনেছে, সন্দেহ নেই। এক উৎকট প্রচারের যুগে সেটা সংবাদ হতে পারে, কিন্তু তাকে সাহিত্য বলবো কেন?

আমার মতে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা প্রভাব বা শক্তি হিসাবে 'কৃত্তিবাস' কোনো দিনই সক্রিয় ও উদ্দেশ্যময় হ'য়ে ওঠেনি॥

আলোচনাটির সম্পর্কে

অন্ধযুগের আবির্ভাবে যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্থিক সহযোগিতা ছিলো, এ খবরে আমরা প্রীত হয়েছিলাম। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাটিই অন্য নামে বেরোচ্ছে—এ খবর নিয়েও তামাশা করা গেলো। কিন্তু, মরা বাঁচানোর উপায় আমরা জানি, এ খবর আমাদের প্রীতির উর্ধ্বে'। বলা হয়েছিল, মৃত ঘোড়াকে পুনর্জীবিত করা হচ্ছে, যদিও শান্তিকুমার তা কোথাও লেখেননি। সুনীল সম্পাদিত কৃত্তিবাসের শেষ দিনকার সংকলনে শান্তিকুমার ঘোষের একটি প্রশস্তিমূলক পত্র আমরা পড়েছিলাম। ৮।৯ বছর পরে, তাঁর প্রশ্ন প্রবন্ধে জানা গেল, কৃত্তিবাস কাব্য আন্দোলন নামক অভিধাটির সঙ্গে কোনো ভাবেই জড়িত নয়—দীর্ঘদিন ভেবেই তিনি মতপরিবর্তন করেছেন মনে হয়। শান্তিবাবু প্রশ্ন তুলেছেন একটি অনুমানের পরে। 'কবিতা' 'সাহিত্যপত্র' প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একদল কবিকে আলাদা মুখপত্র করতে হলো: হয়তো বর্ষীয়ান সম্পাদকরা বুঝতে পারছিলেন না, সুবিচার করতে পারছিলেন না নবীনদের পদ্যসমূহ। আমাদের ধারণা, এ অনুমান ঠিক নয়। কবিতা বুঝে ওঠা বা সুবিচার করা বলতে ঠিক কী বোঝায় আমরা জানি না। কিন্তু, প্রবীণদের সুবিচার বা উপলব্ধি একজন তরুণের পক্ষে খুব দরকারী নয়: তাঁর সমসাময়িকদের প্রতিবেশিত্ব এবং সান্নিধ্যই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আরো হতাশ হতে থাকি, বুঝে পাই না, ঐতিহ্য, সৌন্দর্যবোধ ও মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধে কবিরা আদৌ কিছু দাঁড় করাতে চাইবেন কেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথের কথা বললেন—তাঁরা তো সেই প্রশস্তিপত্র লেখার সময়েও জলজ্বলে ভাবেই ছিলেন, তবে কি তখন তাঁর চোখে ধরা পড়েনি? এই দুজনের কবিতা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কারো কারো ভালো মন্দ লাগে। ক্লাসিক পর্যায়ে তাঁদের রচনা বিবেচিত হচ্ছে—দেখে আমরা শিউরে উঠলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিলো মূল ভাষাপ্রবাহের সঙ্গে এঁদের লেখা কতোটা যুক্ত বা বিযুক্ত। অনেক আলাদাধরণের কবিতার অভাবিতপূর্ব চিত্রগুচ্ছ প্রয়োগ এবং পয়ারের মহাপ্রাণতা নবীনভাবে অধিকার করা স্বতন্ত্র ও সম্পন্ন জীবনানন্দের পাশে এই দুজন কবির সংকট বাংলা ভাষার তারল্য বা জনৈক আন্তর্জাতিক কবির স্নেহচ্ছায়া, যদিও, রেফারেন্সকণ্টকিত এই দুজনের লেখা পড়লে রবীন্দ্রানুসারী স্বভাবের আঁচই আমরা পেয়ে থাকি। সুধীন্দ্রবাবুর শব্দসজ্জা কতকাংশে মহাকাব্য-টানহীন মধুসূদনের মতো, এবং কবিতার আবহ বৈচিত্র্যবর্জিত রবীন্দ্রলিরিকের আবহ। এঁদের আপাতকাঠিন্যপ্রীতি পরবর্তীকালে বাংলাভাষার কবিদের কাছে গ্রাহ্য হয়নি। যে কারণে, বুঝতে অসুবিধে হলো না কেন তাঁদের রচনা ক্লাসিক পর্যায়ে বিবেচিত হচ্ছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিলে, যখন সংস্কৃতইংরাজিপংক্তিপ্রাণিত পদ্যের রমরমা, বাংলা পদ্য লাইব্রেরিঘরের অভিজাতঠাণ্ডা গন্ধে ম ম করছে, কৃত্তিবাস পত্রিকাটির পাতায় তারই একটা ননএকাডেমিক র‍্যাপ্রোচ আমাদের উৎসাহী ও বিমূঢ় করেছে। নইলে, যাঁদের নিয়ে আলোচনা প্রায় আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিল, আবার তাঁদেরকেই পাড়ার মধ্যে অন্য কোন তাগিদ ছিল না। এঁরাই বছর কুড়ি কাব্যচর্চার পর ক্লান্ত—এ কারণে নতুন করে ভাবতে হল।

যদিও, শান্তিকুমার জানতে চেয়েছেন, স্বকীয়তাই কি একমাত্র গুণ? নিশ্চয় নয়, এবং কবিতার কোনো গুণ থাকেই না, ক্রমাগত জীবিত হতে থাকার ধর্ম ছাড়া। সে ধর্মটা কেবলমাত্র পরবর্তীকালের কবিদের প্রভাবিত করা নিয়ে নয়। বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই আপাতঅর্থে এখনকার লেখকদের প্রভাবিত করছেন না, কিন্তু আমাদের স্মৃতিবিস্মৃতিতে তিনি থেকে গেছেন। আমরা জানি সক্রিয়লেখক এবং পাঠক হিসেবে কৃত্তিবাসের কবিদের একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু পক্ষপাত ও অনেক সময় সাহিত্যের শর্ত হয়। আলগা কথাবার্তার জন্য এমন বলা যায় না, এঁরা অকবি। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে মাইকেলের তুলনায় এবং বসন্তরায়কে বিদ্যাপতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে—আসলে নিজের রুচিবলয়কেই গড়ে

নেবার জন্যে। তাতে, মাইকেল বা বিদ্যাপতি বা রবীন্দ্রনাথ কেউই অপাংক্তেয় হননি। বিশ্ব এবং সমষ্টিগত সংকটবোধের অবহিতি কৃত্তিবাসের কবিদের ছিলো, কিন্তু তাঁরা উপরিতলে আবদ্ধ ছিলেন—এমন মনে হয়েছে অভিযোক্তার। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সে পৃথিবী শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকদের পৃথিবী, এবং সেখানকার সমস্ত সংকটই মানবসভ্যতার নিজস্ব সংকট নয়—আরোপিত সংকট। যে কারণে, ভিয়েতনামে প্রত্যেকদিন মানুষ মরার খবর শুনেও কবিদের কবিতায় কিছু করার উপায় থাকে না—কেননা যে মানুষের জন্য কবিতা লেখা হয় ও যে লেখে সে জনসন / নিকসন এবং খবরের কাগজ পড়া / সঙ্গম করা লোক নয়, হতে পারে না। হ্যাঁ, কবিকে বিমূঢ় করে দেবার মতো সময়েও আস্থাবান হতে হবে—অ্যামেচার কবিকে বিশ্বাস করার দিন চলে গেছে। কোনো কিছু যখন নিষিদ্ধ নয় তখন বিষয়মাহাত্ম্য অভিনবত্ব হয়তো করা যায় না, প্রকাশভঙ্গী পাল্টায়—অন্য বস্তুর আবির্ভাবেই তা পাল্টায়। ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গীর পার্থক্য কিন্তু তা নয়।

আমরা একাডেমিক আলোচনায় এখনি উৎসাহী নই, যে কারণে, যারা অভিযোগ করেছিলেন, অন্ধযুগে পঞ্চাশকে বড্ডো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, ব্যাক করা হচ্ছে, তিরিশ / চল্লিশ / ষাট নিয়ে আলোচনার দরকার আছে, তাঁদের আমরা জানাচ্ছি, যারা আমাদের আক্রান্ত করেছেন বেশি, তাঁদের ওপরেই আমরা কথাবার্তা চাই। তাঁরা শান্তিকুমার কথিত বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নন। আমাদের ধারণাও নেই যে কোনো লেখকের খণ্ড দুই তিন লাইন তুলে কোনো আলোচনা আদপে হতে পারে। যে কারণে, আলোচ্য কবিদের কর্ম খণ্ডিত শীতল অগভীর—এগুলি শুধুমাত্র কোনো বিশেষণ হয়ে থাকল। শান্তিকুমারের সঙ্গে আমরা একটি ব্যাপারে একমত, কোনো আন্দোলনের চরিত্র বা চেহারা আলোচ্য কবিদের ছিলো না। আলাদা আলাদা ভূখণ্ড থেকে আসা কিছু লেখকের প্রিয় পত্রিকা ছিলো কৃত্তিবাস। এ কারণে পরস্পরের সম্পর্কে তাঁদের একই ধরণের ডগম্যাটিক এবং আমি মনে করি গোছের রচনাগুলি আমরা গ্রাহ্য করি না। এঁরা শোষক শ্রেণীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন, পলায়নপর নাগরিকতার বৃত্তি তৈরী করেছেন, কেউ কেউ কমিটমেন্ট এড়িয়ে মিস্টি ভণ্ডামির কেদারায় আসীন—এসব অভিযোগ অংশতঃ সত্য। কিন্তু, মহাকাব্যহীন খণ্ডকবিতার বাংলা ভাষায় এঁদের কবিতাগুলি আলাদা আলাদাভাবে আমাদের পাঠের জন্য থেকে গেলো।

আলোক জ্যোতি রায়

শরীর-শয্যা-নারী ও মন বিষয়ক

শরীর, তুমি ঘুমিয়ে থাকো, এখন তুমি ক্লান্ত, তুমি ভীষণ ক্লান্ত
এখন তোমার নাভির থেকে উষ্ণবাতাস
এখন তোমার চক্ষু থেকে তরল লবণ
মিলিয়ে যাবে পঞ্চভূতে, মহাশূন্যে
ভেসে থাকবে অনন্তকাল ;
এখন তোমার শিথিল হস্ত অনাবশ্যক,
অনাবশ্যক ঠোঁট দু' খানি ;
তোমার রূপের ছলনা
অনেক সয়েছি, আর না। এখন দরকার নেই
হঠাৎ জানার—এখন তুমি ঘুমাও, তুমি ভীষণ ক্লান্ত।

শয্যা, তুমি উদার হবে কথা ছিলো :
মাঠ-পাখি-গাছ উদার ছিলো, যুবক কালের
রেলের গাড়ি বন্ধু হলো উদার বলে—শয্যা, তুমি
স্মরণকালের স্বপ্নে আমার
অন্তরঙ্গ হয়েছিলে, বলেছিলে উদার হবে, লোভ ভোলাবে
কিন্তু এখন তুমিই লোভী—শয্যা, তুমি উদার হবে কথা ছিলো।

নারী, তুমি প্রসন্ন হও—তোমার জন্যে শরীর এবং শয্যা নিয়ে ঝগড়া করি
তুমি ওদের জয় করে নাও—তুমি ওদের ক্রীতদাসের মতন করে।
আমি তোমার ক্ষতের জন্যে এনে দেব পৃথিবীর শেষ বিশল্যকরণী।
তুমি আত্মঅভিমানিনী সাম্রাজ্ঞী—প্রগলভতা তোমার বারণ
তোমায় মানায় বিষণ্ণতা—নারী, তুমি এবার একটু বিষণ্ণ হও।

মন, তোমার উদাসীনতা পথিক-স্বভাব, ভ্রমণ ভ্রমণ……
আঁধার-সহা যাত্রী তুমি—কপট তোমার ঘরের জীবন ;
শীতের দুপুর, গ্রামের মাটি গর্ব তোমার মন, তোমার আত্মভুক উদাসীনতা।

কোলকাতার শেয়াল কুকুর

শেয়াল কুকুর নিয়ে বহুদিন গেল, অবশেষে
পুরাতন কোলকাতার ট্রাম আর জুড়িগাড়ি—দুই-ই ভালোবেসে
আরও কিছুদিন যাবে। ঘোড়ার শরীরে ছিলো রহস্যময়তা
ছোলা ও চাবুক ছিলো সিন্দুকে তাই অস্থিরতা,
অসতর্ক পায়চারি—যেমন জলসাঘরে ছবিবাবু
বাঙলাদেশের জন্যে রবিশংকর আর জর্জ হ্যারিসন ; অলাবু
ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে ঢাক্ পিটছে বিদেশী বণিক।

এ সবই ক্ষণিক
চপলতা। এখন বারোশো ভোল্টে ট্রাম ছুটে যায়
আড়াই H. P. স্কুটারের নারীসঙ্গ বেড়ে ওঠে, কামনায় বাসনায়
টালা ট্যাঙ্ক ফেটে যায়, হরিণ পালায়—পিছে বাঘ
এ মাথা ও মাথা জুড়ে কোলকাতার আজ বড়ো রাগ।
সি, এম, ডি, এ-এর বাঁশি বেজে উঠ্‌লে অকস্মাৎ আতঙ্কে লুকায়
সমবেত যুযুৎসবঃ। মা জননী, কৃপা করো ঐ ছাখো পুলিশ শুঁকায়
একপাটি স্যাণ্ডেল, বদরক্তের গন্ধ……এইবার শেয়াল কুকুর
উঠে আসবে স্মৃতি থেকে ভঙ্গুর অট্টালিকা, বাঁধানো পুকুর
মুমূর্ষু পিতার মতো……।

ধূলায় মলিন হতে হতে অবশেষে
এলিয়ে পড়ার পরে বাজেট বরাদ্দ হয়, কোলকাতার বাঁ পাশে—ডান পাশে
অসংখ্য হাওড়া ব্রিজ ছুরিবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে, বিক্রি হয় না
অনেকেই দরদাম করে কিন্তু শেয়াল কুকুর অব্দি ছোঁয়না।

রৌদ্রগন্ধযৌবনের প্রথমরমণী

কোথায় তোমার সেই অঞ্জনভ্রূকুটি
বনান্তরালের ত্রুটি
সূর্য ডুবে গেলে মুছে যায় নাকি আজও
তাই কি নিভৃতে তুমি সাজো
কপালে চন্দন ? গেলে টিলার উত্তরে
আজও মনে পড়ে
তোমার শিশুরা ভয় পেয়েছিলো বিদ্যুৎ দেখে ?

হে রৌদ্রগন্ধ যৌবনের প্রথমরমণী,
এখনো জানোনি
টিলার দক্ষিণে আছে সংগীতপ্রবণ
যুবকেরা। ক্ষয়িষ্ণু চন্দন
মুছে ফ্যালো—হ্রদের নিকটে সংগোপনে
সিল্কের রুমাল পোঁতা আছে। দেখে অন্যমনে
অঞ্জনভ্রূকুটি করো—যা তুমি করোনি
দীর্ঘদিন, দীর্ঘরাত,
হে রৌদ্রগন্ধযৌবনেরপ্রথমরমণী।

রজনী, দুয়ার খোলো

ঘরের মধ্যে রজনীগন্ধা সাজিয়েছিলে
বাহির দ্বারে নীল ফ্লুরোসেন্ট জ্বালিয়েছিলে
গরাদবিহীন জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলে
কিশোর পথিক যেতে যেতে ফিরে বলেছে অবাধে
'রজনী দুয়ার খোলো।'

এখনও সময় রয়েছে……এখনো মৌন কিশোর,
ম্লান যুবকেরা অনায়াসে হাঁটে ঋজু রাজপথে ;
এখনো বৃদ্ধ, প্রাজ্ঞ প্রৌঢ় কতো অনায়াসে
ভালোবাসে এই বিষাদগ্রস্ত ক্লান্ত নগর।

অন্ন চেয়েছে মিছিলে মিছিলে আর্তনাদ
গর্জন ওঠে অবাধে আকাশে চোখ ঠেরে
মৃতা তরুণীর শীতল শরীর ওঠে কেঁপে
কবর সরিয়ে কফিন ভেঙ্গেছে দস্যুরা।

ফুটছে গোলাপ থরে থরে, কতো আকন্দ

ঝরছে গভীর দুঃখে, ভীষণ অবহেলায়।
বালকেরা যায় দূরদিগন্তে বাণিজ্যে
বালিকারা যায় দল বেঁধে ঘন অরণ্যে।

নেমেছে শীতের সন্ধ্যা বিজন পানশালায়।
ক্লান্ত কিশোর খুঁজছে কোথায় তৃণভূমি।
নিভেছে নিওন, জলেছে নিওন, নিভছে·····জ্বলছে
পায়ে পায়ে পথ গিয়েছে শান্ত সরোবরে।

এখনই সময়·····এখনই সময় সমাহিত
এখনই বৃক্ষ ছায়াও দীর্ঘ·····প্রশান্ত,
এখনই দুয়ার খোলো
'—রজনী, দুয়ার খোলো,
রজনী এখনই·····এখনই রজনী·····' কিশোর পথিক বলে।

বীতশোক ভট্টাচার্য

ঘুম

ঘুমিয়ে থেকো, ঘুমিয়ে থেকো ; ঘুমিয়ো, তুমি ঘুমিয়ো
জলের তলার শান্ত হাতে, চিরকালীন মহিলা :
কী একতাল শরীর··· ! ছেনে মাটির মল, ময়লা
তোমাকে করে নিষ্কাশিত : তুমিও, তবে তুমিও

আজ গৃহহীন, তোমায় ছিঁড়ে ছন্দে খাওয়া শ্যাওলা
দোলে, ঘুমোয় : কী নিষ্ঠুর ! আচ্ছন্ন, অনীহ
তাহলে, এই, তুমিও হও : আহার করো, হে গৃহ,
আটকে থাকা মাংস, প্রাণ, হৃদয় শুঁড় পা-অলা।

মাছি

একটি মাছি এসেছে উড়ে, মক্ষিকা এক একদা
লোলুপ জিভে নিয়েছে চেটে সে অক্ষর, যে কথা
তোমার ভিতর ছিলো এবং তুমিও যার ভিতরে
রয়েছো, তাই একটি মাছি পুঁথির শাদা পাথরে

বসে এবং বসেই থাকে : অপেক্ষা এই, আখরে
শব্দবিহীন হাজার চোখের সে গুঞ্জন, যা ঘোরে
তোমাকে শুধু কেন্দ্রে রেখে : সারাটা দিন ধ্রুবতা
গানের পদ, বদ্ধ তবু পুঁথির শাদা পাথরে।

ভাসান

হাওয়ায় দিই, হাওয়ায় দিই, হাওয়ায় দিই ভাসিয়ে
দৃষ্টি আমার, তোমায় দেখার সমস্যায় প্রশ্নে পরিকীর্ণ
শ্যাওলাদামে ভাসতো নয়ন···তাকেই নিয়ে রাশি এ
ধারালো নীল মেঘ ছড়ানো, যেন বা এক দিব্য

সায়রে দেবো দৃশ্য শরীর, ডুববো, আমি ডুববো
সমস্তদিন···কিন্তু ধরো, উজ্জ্বলতাও তোমার কোনো চিহ্ন
পায় না : তবে উদয়াস্ত এ আমি, ভিন্‌দেশি এ
কোন অন্ধকার ভাষায় তোমার ও দ্বীপ—দিক চিনবো ?

আনয়ন

অকারণ কী এসেছো নেবে, আবার, ক্রূরকরুণা ?
অনেকদিন মেঘহীনতায় দূরের দেশ ধারালো ;
প্রখরতর ধূসরতা কী আবেশ তবে, তার আলো
ঠিকরে পড়া দীর্ঘ শীতল দৃষ্টি, বিদ্ধ করে না

আমরণ এক বর্ষা যেমন তরলতম কিরণে— ?
বিদ্ধ করে, বিদ্ধ করে·····সেভাবে অমাযামিনী
কাটে না ; তবে হে মেঘময়, অনভ্র জয় আমি নিই :
অকারণ কী আসছো নেবে, তা হ'লে, ক্রূরকরুণা ?

বন্ধন

কী তোমার বাহুবন্ধন যাতে ঘিরে ফেলো সম্পূর্ণ ?
শৃঙ্খল তুমি নিয়ত বাজাতে, নিয়মিত তার ধীরতা

ভেবে ছিলো বেঁধে ফেলেছে আমাকে, যেন আমি এই চিরটা
কাল ধরা প'ড়ে রয়েছি তোমাতে, বহুদিন ধ'রে চূর্ণ

আমার হৃদয়, তা-ই বুঝি আজ এতো চাপে সংসক্ত ;
এতো নিরুদ্ধ বাষ্প, তরল ভার হ'য়ে চোখে, কণ্ঠে
ফেটে পড়ে প্রায়, কিন্তু তখনো জানতে কী···তুমি জানতে
পুর-পরিখায় ফেলে যাবে তারা, আর আমি অনতিত্যক্ত।

নৃত্যপর

নৃত্যপর জানি না কার স্তনের রন্তে এ তারা
আটকে ছিলো, মৃত্যু নয়, আলোকময় ঝর্ণায়
লাফিয়ে নামে ; হে সন্তান, মানুষ, আমি প্রহরা
শিথিল করি ?···হরিণী, হায়, পদ্মপাতার জল নয়

তাঁর ও তেজ এসেছে ব'য়ে অথচ তোকে হরিণা
যে বীর্য দেয় সে এক ফল···তবুতো শাঁস ঋষিকে
দিলি, এখন ফাটে সে বীজ ফোটায় তোকে কী শিঙে :
বেদনা, তুই নৃত্য কর, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি না।

হরিণ

কে তুমি আজ হরিণ, যাও, সঘনস্রোতে গগনে
তারা ছিটোও, অদেখা ক্ষুর, শাণিত রূপো, অরণি
ও শিঙে জ্বলে : কোথায় জল, পায়ের তলে ধরণী
সরাও, আর হরিণ ধাও, সোনার কণা নয়নে

সোনার কণা শরীরে আরো, এতো অনল, হরিণী
নিলয় পায় তবে কোথায় ?··· কোথাও, কার চরণে
হিরণহার ছিঁড়ে লুটোয়, যা তুমি গেলে আমি নিই
মালায় গেঁথে, বরণ কী এই রশ্মিখরকিরণে !

কণ্ঠ

তুমি থাকো এসে একটি পাখির কণ্ঠ :
মর্ত্যসুষমা, স্থিরতম অভিব্যক্তি ;
স্বর্গশরীরী-শরীরিণীদের দ্বন্দ্ব
প্রকাশিত এই কথা থেকে, তবু একটি

আরো কী একটি স্বর, যেন এক মন্ত্র
লুপ্তির পথে, যা এক অজানা মাত্রা
খুঁড়ে তোলে এক ধ্বংসশহর, আর ওই শান্ত মন্দ্র
ওই আনন্দস্তব্ধতা গান, পাত্র ও পিপাসার্তা।

অরণি বসু

'ওগো ঝর্না, তুমি আসবে কি'

অভিসার

বিছানায় শুয়ে আছে একটি চুলের কাঁটা, সে কি তবে এসেছিলো ?
সারাদিন পথে পথে ঘুরেছি অনেক,
উজ্জ্বল হর্ম্যসারির ভিতর বাহিরে হানটান করেছি একাকী
সফলতা কাকে বলে, বুঝিনি কিছুই।

আমার বিছানা জুড়ে শরীরের উষ্ণ স্পর্শ লেগে আছে,
সে কি সত্যি এসেছিলো ?
এই স্তব্ধ ঘরে সারাদুপুর কি করেছে সে ? কার সঙ্গে ছিলো ?

প্রেম

প্রেমের মধ্যে ছিলো অঙ্কুশ, ছিলো ভূত-প্রেত
তবুও তো প্রেম হয়, হ'য়ে যায়
প্রমোদ তরণী চ'ড়ে চলে যায় প্রেমিক যুগল
শীত ও গ্রীষ্মে জড় হয় সান্ধ্য ময়দানে, বেলা পড়ে আসে
বেলা পড়ে এলে ফাঁকা হয়ে যায় বাজার ও বুদ্ধিজীবি মাথা
প্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়ে পাঁশুটে ভিলেন, অতীতের ভূত-প্রেত
মাংস খায় প্রেমিক-প্রেমিকারা, হাড় চিবানোর শব্দ ভাসে পৃথুল বাতাসে
এরোপরে বিয়ে হয়, কদাচিৎ লুকোচুরি হয়
কখনো সখনো বিবাহোত্তর যুগে ছাখা হয় হাসি ও বেদনাসহ

যেন এই মাত্র তাঁর স্মৃতি জানালো বিদায় এমনই
সর্বস্বহারানো তাদের মায়ের কণ্ঠস্বর
ম্লান সন্ধ্যাবেলা খালিগলায় তিনি গান অদ্ভুত বিদায়-সঙ্গীত

ঠেস

'তুমি মোটে আধুনিক নও'—এই ব'লে শিবানী নাচায় সকৌতুকে চোখ।
আমি নই প্রতিভা বিশেষ, নই তরঙ্গরাশির মত বিস্তৃত—
এই সব জানি, আরো জানি আধুনিক শব্দটি বড়ই রহস্যময়
জটিলতা তার নারী-নয়নের চেয়ে কিছু বেশী

স্মিত হাসি আমি, হাত তুলে জানাই সম্ভাষণ
বলি, 'আধুনিকতার তুমি বড় কাছাকাছি, সাবধানে থেকো।'

আমি

একটা মোটে জীবন আমার, যেমন ইচ্ছে ঝাঁপান ছুঁড়বো
হস্তপদ স্থির করেছি, চিৎ-সাঁতারে কাটাবে বেলা
খেলবো খেলা পছন্দসই, মধ্যযামে ভাঙবে মেলা
মাথার মধ্যে হরেক গোকা, শরীর ভর্তি দত্যিদানো
আমি কেমন, এখন তো তার অল্প স্বল্প তুমিও জানো

পরজন্মে অবিশ্বাসী, একটা মোটে জীবন আমার
ডরাই কাকে? ভাগ্য আমার পাঁচ মিশেলী করবেথায়
লাইন টানা জীবন যাপন অন্যলোকের, আমার তো নয়
নিন্দেমন্দ, কবিখ্যাতি—সবস্থানেতেই আছি আমি
এবং আছে আরেকজনা—তুমি, গৌরী, অন্তর্যামী

শর্তাধীন

নানা রকম পদ্য আছে, সবই আমি তোমায় দেবো
সাধ করেছি মরতে হবে, মরব যখন থাকবে তুমি শিয়র জুড়ে
পোকায় কাটা বাল্য স্মৃতি, জাহাজ ভরা খেলনাপাতি
সবই আমি তোমায় দেবো, দেবো তোমায় একটা জীবন, রুনুর-ঝুনুর,
তার ভেতরে পদ্য নানা, গদ্যও নয় যৎসামান্য
দেবো সবই, দেবোই, তবে শর্তাধীনে
একটা কেবল শর্ত আমার
সারাজীবন, ভেবে দেখো, থাকবে পাশে সারাজীবন?

মেজাজী প্রেমিক

ওই শোনো কে আজ বাজায় বাঁশী, দূর-অন্ধকারে
প্রতীকের নয়, স্পষ্টতই সে বাঁশী কাঠের
এত কথা বল কেন তুমি, এত কি বলার আছে
এই সূর্যাস্তের নীচে কি আর শোনার আছে বাঁশী ছাড়া
তুমি বাঁশী শোনো, লক্ষ্য কর মানুষের ত্রস্ত চলাফেরা,
নয়নাভিরাম দৃশ্যরাজি, আকাশের।
চানাচুর এরো বেশী কিছু দিতে পারে না তোমায়
বায়না কোরনা আজ, কোনো নিষেধ কোর না আজ
যে রকম বলি, চুপ ক'রে বসে থাকো, আর আরো ভালবাসো।

গার্হস্থ্য

কত কি বলার ছিল, সব শব্দ সান্ধ্য অন্ধকারে ডুবে যায়
পেঁজা মেঘ বাল্যের ভূগোল থেকে উঠে আসে আকাশে আকাশে
জ্যোৎস্না-ঝরানো চাঁদ স্থির চোখে লক্ষ করে পৃথিবীরে
বহে যায় বেলা, নর তুলে নেয় নারীর কোমল বাহু
'তুমি কি আমার' এই প্রশ্নে থমকে দাঁড়ায় শহর ও গ্রাম
থমকে দাঁড়ায় আততায়ী, পুষ্পে যার বিষমিষা; সংগীতে অপ্রেম

সবই ক্ষণিক, মাত্র কয়েক দণ্ডের, তারপর বাস চ'লে যায়
ট্রাম চ'লে যায়
রসিকতা থেকে রসিকতায় যাবার আগে পথচারী উঁকি মারে প্রেমে
মানবীর বাহু খসে যায়, শাড়ী খসে যায়, শরীরে শরীর জেগে থাকে শুধু

মায়াজাল

ঘন উচ্ছাস হঠাৎ তরল হ'য়ে আসে, এক সন্ধ্যেবেলায়
নভোবসন্ত থেকে ঝরে পড়ে যখন আষাঢ়
বরুণার কথা মনে পড়ে খুব, হৈচৈ হয়,

সন্ধ্যেবেলায় স্তব্ধ ঘরের দুঃখে ও রাগে, ঝনাৎ শব্দে
ভেঙে যায় সব কাঁচের গেলাশ, এখন বরুণা অচেনা রমণী
তুমি যে কোথায়! বড় সাধ জাগে খেলা করি আজ
পরের বাগান থেকে তুলে আনি কাগজের ফুল
নিভৃতে তোমার খোঁপায় পরাই, উড়ে যাবে দূরে
লঘু আপত্তি আঙুলের চাপে, এই তো সময়
বরুনা আমার, কাল বসন্ত—বাইরে আষাঢ়, মুখ তুলে যদি
চোখে রাখো চোখ, হাসনুহানা পড়বে কি ঝরে
বিকেলবেলার অমন যে হাওয়া হঠাৎ উধাও হল কোনদিকে
এখন শুধুই আমার হৃদয়, আকাশে বাতাসে বৃষ্টিতে ভেজা
বরুণার কথা, বরুণা তোমার সময় হবে কি?

অঞ্জন সেন

যারা দূরে যাবেন

দ্রুতগামী কিছু চলে গেলে, হাওয়া কাটে
ধূলোরা জায়গা বদল করে
হাঁচি আসে,
পাহাড়ে বেড়াতে যান—শরীর খারাপ যাঁদের।
যারা দূরে যাবেন
চোখের ওপর হাত রেখে দেখেন
সেখানে কেমন হবে থাকা।

ভানুমতী বেশ আছে
জানে না ভারতবর্ষ কোনদিকে।

নিভন্ত ঋতু

সাদা গোলকের পরে আরো সাদা গোলক
দ্রুত যাতায়াত করে,
আমরা দেখেছি শিকড়বিহীন গাছের ঝড়
ছড়িয়ে পড়ার জায়গাগুলো পেছিয়ে যায় রেদু
কালো থামের পাশে আরো কালো থাম
বেলা পড়ে ব্যর্থ প্রেমিকের চিঠি হয়ে
ব্যস্তবাগীশ লোক, তাড়াতাড়ি ফেরার মুখে
ঝুঁকি নেয়

ঝুঁকি নিতে নিতে কত সরু হয়ে গেছে
পৌষ মাস।

শিল্পদিনযাপন

দুপুরবেলায় কালোমেঘ উড়ে গেল কলকাতার ওপর দিয়ে
'জল চাই' হাঁক দিয়ে ভিস্তিয়ালা দেখল আকাশ
বর্তুল আনন্দে শিস্ দিতে দিতে ধরল রাস্তা

বিকেলবেলায় প্রেমিক দেখেছিল টুকরো টুকরো মেঘ
যে ভবিষ্যত ভাঙনের কথা ভাবছিল
ভোররাত্তিরে বনবুড়ো কাঠের বোঝায় কুঁজো
জ্বলেনা প্রদীপ কোথাও
হরিণের চোখের আলোয় অরণ্যে ভোর হয়।

পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়লে কবিরা ভাঙাগড়া তুলে ধরে
জীবনের শেষে নক্ষত্র হয়ে ফোটে
আর প্রেমিকের হাসিতে আকাশ উদ্ভাসিত হয়

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি অলীক
নাকি ভালবাসার অসীম
এই যে আমার এলোমেলো ছবি
শিল্পদিনযাপন শুরু।

নির্মাণ

শোনো ছোকরা
রাস্তাটা কেমন তোমাদের, একটু বাঁকা?
জনৈক মাতব্বর প্রশ্ন করেন
ছোকরা ঘাড় নাড়ে

যুদ্ধে তাড়া খাওয়া সৈন্যের মত আঁকাবাঁকা, কিন্তু সহজ
অফলা অফলা—ওরা বলে
জমির অনুর্বরী ওষুধ
যুবক ছিপে মাছের মত শব্দ ও নারীকে টানে
নিজেই সে তৈরি করে দর্শন
ছড়িয়ে রাখে বইপত্র, মেঘ এলোমেলো।

বিরাশী সিক্কা গাঁট্টার মত ভারী কিছু এসে পড়ে
মঞ্চ ও পাঠাগার থেকে
মগজটা ছোট ব্যাসে মাপা যায়
পিছলে পড়ে পাঁকাল
কেবল স্থির থাকে খরা,
যুবক ভাবে
বরং নিজেই কিছু তৈরি করি।

ক ল কা তা

কলকাতা আয়েস করছে
সহিষ্ণু গাছেদের দান সরে গিয়ে
দাঁড়িয়েছে মাঝগঙ্গার জাহাজের ওপর
জাহাজটি এক অতি পরিণত কিশোরের চোখে ভাসছে।

বাড়ন্ত ঘর, বাড়ীর পেছনে আরোও অনেক বাড়ী
চলন্ত ধাপ, ধোঁয়ার জটলা উঠছে শূন্যে
উঠতে উঠতে কখন পাখীর শরীর আড়ালে ফ্যালে
কখন মাছের আকার ভাঙতে ভাঙতে নামছে
কলকাতা বাড়ছে।

উত্তর বিহার থেকে তীর্থযাত্রীরা আসছে সার বেঁধে
তান্ত্রিক যুবকেরা কলকাতা ছেড়ে গেছে
তাদের পায়ের চিহ্ন মিলিয়েছে গুহায়;
কেউ জানেনা
বিজ্ঞানীরা ফুঃ দিয়ে অর্বুদ অণু ওড়ায়
এইখানে থাকতেন মধুসূদন দত্ত
কেউ চিনতে পারেনা
কথাবার্তা চলে
সরে আসুন
নর্দ্দমার ভেতরে থেকে উঠছে হাঁস
চলছে গাড়ী, যাদুকরের
খোঁড়া ভিখারী চমকে দেখে
আসছে এক বস্ত্রখণ্ড;
বৃদ্ধের ছড়ি ছোঁয় শ্রীরামকৃষ্ণের স্ট্যাচু।

কলকাতা আয়েস করছে
ভাসছে জাহাজ
ভাসতে ভাসতে
এক পরিণত কিশোরের চোখ

দ্যৌস্ আসছেন

উড়ছে
পাখীর পালক, সুন্দরীর চুল, ভালমন্দ
উড়তে উড়তে হঠাৎ
থেমে যাওয়া
বেড়াল একটানা কাঁদছে
এক ঝাঁক বাদুড় টেনে নেয় নির্মল আকার

আমি ছাদ থেকে দেখছি
একবার নীচে ওপরে একবার
মেঘ ভেদ করে
দ্যৌস্ আসছেন!

পা রা পা র

রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে
ব্যাকরণ সম্মত রাস্তা
অথচ সূক্ষ্ম এই চলাচল
প্রোজ্জ্বল বিজ্ঞাপনের আড়ালে।

নিশীথ ভড়

জলবন্দী, তার প্রেম

এখানে জল চতুষ্পার্শ্বে বন্দী আমার শিলাখণ্ডে
ভাসছি, আজীবন কি ভাসে, শ্যাওলা জন্মমরণবিহীন।
কেউ আসেনা, পদচ্ছাপে অনেক বাধা, মধ্যবর্তী
সাঁকোটি নেই নানানবর্ণ দুঃখে হলো সমাচ্ছন্ন
এসব আমার একলা দেখার সৌরবিজন নিভন্ত হে।

কে ঘুরছিল চারপাশে, সে বালা, মধুর নিষ্ঠুরতা।
চাকভাঙা মৌমাছির জ্বালায় নিয়তির তিনভগ্নী পালায়
আমার হাসি এই শহরের মুখের সংগে দারুণ মানায়।
সত্যি বলতে, গঙ্গা, সেতো বেড় দিয়েছে পায়ের কাছে—
ঢলের শব্দ, মৃত্যুশব্দে, স্বপ্নশব্দে দারুণ বাজে
তার মধ্যে অপেক্ষমান কাহার পাশে আমার কথা!

কে তুমি ওই সর্বশরীর নিয়ে জলছ মৃদু, অরব।
মৃদঙ্গবোল ক্রুরআঙুলে বাজেনা আর গুঞ্জনভার
চুম্বনে নয় খুব সমর্থ, দাঁড়াও, আমি পিপাসার্ত···
এমন আভাস আগে দেখিনি, লোকালয়ে-নির্জনে না,
ঝরো অস্থিমাংসে ঝরো, আরো, প্রিয়তমার শরীর॥

তৈজসের ও দেখা পাইনি

সুতোয় গাঁথা প্রণয়রাশি ওড়ে আমার হৃদয় জুড়ে
ওখানে তোর নূপুর বাজা, আধেক ভাঙা ধ্বনির চিহ্নে
যা আছে তা সব মুছে যায়, স্তনে করাঙ্গুলির মতো
এ অনন্ত চিত্রশালা ঝাঁপ দিয়েছে মদের পাত্রে।

ও মদ, জ্বলো শিখার সূত্রে সুড়ঙ্গপথ, ওই গভীরে
প্রাচীন লিপির মতো জ্বলো জরাগ্রস্ত অভিশপ্ত।
জ্বলো হাওয়ায় অন্ধকারে ব্যাকুলতার রন্ধ্রটি শ্যাম
পেয়েছে, বাঁশি বাজায়, নূপুর কি আরো ক্রুর হবে রাধার।

এমনভাষে খেলতে-খেলতে খেলনা কত টুকরো হলো
জন্ম তোকে মনে পড়ে না, ভ্রমণে কত মনোচ্ছবির
ময়লা জমে উঠল মুখে, এ গহ্বরে কে দেবে পা—
লেলিহ্ লোল জলো তরল, তরলতার সরল অঙ্গে,
সুতোই যদি ছিড়ে পড়বে, বর্ণমালা দুলবেনা আর,
ভ্রূকুটি কার কঠিন হয়ে উঠবে মন্থনের মতো।
যাবো কোথায়। নিরুদ্দেশও বাধা গড়ল আপন হাতে;
এজন্ম বাম, প্রিয় কোনো তৈজসের ও দেখা পাইনি।

নায়িকা কল্লোল

'বিষণ্ণ তোর করপল্লব জলকল্লোল ছুঁয়েছুঁয়ে যায়
পিছনে গোধূলি, দণ্ডায়মান, সমুদ্রে ছায়া পড়েনা কখনো।
তাই সুখ নেই, গূঢ় তামসিক দুঃখও নয় বর্ণপতাকা;
তিনদিক জুড়ে ঘোর স্তব্ধতা অশান্ত হাওয়া জড়িয়ে রয়েছে
একটি বয়স, একটি বয়সে ফুলসজ্জার শুধু হেসে ওঠে,
একটি বয়সে একটি বয়স গাঢ় আক্ষেপে শুধু রণ চায়,
একটি বয়সে একটি বয়স পশুর বেদনা নিয়ে প্রবিষ্ট,
কোনো স্মৃতিরেখা জলে না জলে না কোনদিন তুই এখানে দাঁড়ালে"

দক্ষিণদেশে আছে মধুঋতু, আছে সম্পদ তোমার জন্যে
এখানে যেমন চোখ চলে যায় বড়লোকদের বাড়ীর বাগানে
ফোয়ারা ও পরী পিয়ানোয় বাজে, রূপকথা, তুমি চলো দক্ষিণে
কখনো সাগর দেখোনি কখনো একলা যাওনি আমার সংগে

"দক্ষিণে কোনো বসন্ত নেই, কেন দক্ষিণ আহত করেছে
কৃপণ আমাকে, এখানে দাঁড়ালে অবিনশ্বর হতে সাধ হয়।
শারীর-স্পর্ধা স্রোতোবিপক্ষে একাকী যুঝছে, দর্পণহীন
প্রিয়প্রতিরূপ বিচূর্ণ হলো, নীলাম্বু বেপে যেন শয়তান
আমার লোভেই সজ্জিত, আমি আর কতদিন এখানে দাঁড়াব,
আর কতদিন বয়স থাকবে, আর কতদিন মরণ হবে না,
আর কতদিন তোমার শরীর আমাকে ছোঁবেনা, দাঁড়াও দাঁড়াও
দয়িতের ঘরে শাদা শূন্যতা কেঁপে ওঠে, আমি ফিরে যেতে চাই।"

বাজো তো নিরানন্দে

কুঞ্জবন মুঞ্জরিত নয় আমার ঘর ছুঁচোর গুঞ্জনে
ভরে উঠছে অকীর্তির ভয়ে অঙ্গ ঢেকে মেধাবী চন্দন।
সে চন্দন কৃষ্ণনাম তার রাধা কেবল ঠোঁটে রক্তরাঙা
চক্ষুদুটি মৃগাক্ষিকে হার মানায় লোল দশন আধভাঙা।

আমি যখন ঘুমোই কেশপাশ আপন করে নেয় তখন সেই
খুঁড়ছে দাঁতে ঘিলুর সর্বনাশ ও যেন অপপ্রতিভা তাড়াবেই।
একটু পরে এসে পায়ের কাছে খুবলে নিল নখের চারুকৃতি
স্বপ্নে আছে জাগরনেও আছে আজন্মকাল এমন সম্প্রীতি।

যদি কোন আরক্ত অক্ষর আমার মর আঙুল ছুঁয়ে যায়
শিল্পে, তাকে সমূহ নশ্বর করে সে দ্রুত প্রণয়ে, আছড়ায়।
কখনো ঘোর অন্নসন্ধান আমাকে বার করলে ঘর থেকে
বিজনে তার বিরহ খরশান প্রহার করে মেঝের চৌদিকে।

সে সব শুভ গহন গহ্বর দেখে আমি জীবন বদলাবার
কথা ভাবছি, আর অতঃপর কেইবা আছে, কোমল সংসার
ধাতে সয়না, তারও একদশা দুঃখে এই জগত পরবাস—
মাধব, পরিণাম কি নৈরাশা! একাকী তুই আমায় ভালবাস।

ছুঁচো, ন্যাক গুল্লারোগিণী মাংসে-ত্বকে মানবী প্রিয়তমা
আনন্দহীন আমি, ও মানিনী বাজো তো নিরানন্দে নিরুপমা॥

সমাধি ফলক

এ সেই সাপ, যে নিজের ল্যাজ থেকে খেতে শুরু করেছে, ও
আমাকে কেউ নিয়ে যাবে কি উন্মাদিনীর দেশে
এই শহর, তোমার শহর, তোমার ছবি, বাতিল চিত্রশালা
আমার মুখ দেখো না কেউ, আমার মুখে পুড়ছে চন্দন

কতবার, মা, আমার জন্মের আগে যৌনানন্দ পেয়েছিলেন, ভয়

এ ঘরে মেঘ জমে না কোনোদিন
যদিবা জমে সে মেঘে জল নেই

শাদাহাওয়াকালোহাওয়া কাটাকুটি করছে আর মাথাময় পিতৃহীন ব্যথা

প্রণয়িনীর মড়া আমার শেষ পারানির ঘড়া আমি বন্ধুদের
মোহর রাখি তাতে

শ্রাবণের লোপামুদ্রা

আবার ডেকেছে মেঘ, কম্বুকণ্ঠে, লোপামুদ্রা হারমনিয়ম বন্ধ করে
ছুটে এলো এক চিল্‌তে কমন-বারান্দা দিয়ে, নিরঞ্জন, নিরঞ্জন দেখো
আবার শ্রাবণ এলো যেন তার অধিকার যে কোনো সময় এসে
যাচ্ছেতাই, ভীষণ জ্বালানো,
নিরঞ্জন, তুমি আজো দেরী করছো, মেঘ ডাকছে, আমি গান রেখে
তোমাকে ডাকার স্বর পেতে চাই, তুমি কেন এখনো এলেনা,
তোমার কিসের কাজ কিসের ব্যস্ততা এতো, শ্রাবণ তো কই
আমাদের ঘরে আসতে লজ্জা পায় না, তুমি শুধু পাও।
নিরঞ্জন, আমাকে কি ভালবাসো, সত্যি জানো, আমার বাবার
তেমন সামর্থ নেই বিয়ের নগদ দিতে, তুমি কেন ছবি দেখলে
কেন তারপরও এলে, গান শুনতে চাইলে শুধুশুধু;
এলে যদি আরেকবার এসো, আজো বৃষ্টি পড়ছে, হারমনিয়মের
দিকে না তাকিয়ে আমি খালিগলাতেই গাইব
শোনো নিরঞ্জন, আমি আমার বয়স
লুকিয়ে বলেছি, ঠিক এখন পঁচিশ, তাকি সত্যি খুব বেশী!
তুমিও তো ছোটো নও; এতক্ষণে লোপামুদ্রা মেঘেদের চলে যাওয়া দেখে
ঘরের কোনায় আসে, হারমনিয়মের চাবি খুলে দিলে
অমাজিত গলা থেকে রবীন্দ্রসংগীত
শ্রাবণের মত ঝরে, কি মিথ্যুক, শ্রাবণের সত্যি এতে আসে যায় না কিছু।

ঈশ্বরকে নিয়ে শেষ লেখা

মাইরি বলছি, ভাবা যায় না, ঈশ্বর শব্দটি যদি না জানতুম, কি হতো আমার
ছুটি-একটি ম্যানিফেস্টো: সত্যি কি সামর্থ্য রাখে হইরই বণিকবাজার
লণ্ডভণ্ড করে দিতে, এবং আমাকে তার মাঝমধ্যিখানে
বসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, যদি, অস্থানে-কুস্থানে
আবেগ প্রকাশ করে ফেলি, যদি, নারীকে রাণীর সংগে ফিউডাল তুলনা
উঠে আসে। যেরকম একজন অপ্রসন্নমনা
লেখক নিজের সংগে ধবলমস্করা করে লিখেছেন তিনটি লাইন
মানুষ সম্পর্কে মাত্র, আরেকজন সারারাত দেবদারু ও পাইন
বনের ভিতর গিয়ে এঁকেছেন চাঁদ আর গাছের জীবন
সুসময় আসবে ভেবে। পৃথিবীর সুসময়ে শান্ত অধ্যয়ন
করা ভাল, কিন্তু তার আগে নয়, সুসময় নাও আসতে পারে।
তাহলে সে যাত্রা ওই ঈশ্বর আছেন, আর দূর সিন্ধুবারে
একটি মানুষী চোখ, মনীষার আলো, মেধাবিনী
নিশ্চিত রয়েছে, নয়ত কল্পনায় আছে, তাই সত্যি কি পারিনি
ফেরাতে নিজের চোখ, 'হে ঈশ্বর ক্ষমা করো,' আবার ঈশ্বর
বল্লে জর্ডনের জলে ফেলে দেবো, ওই কবি-শিল্পীদের সংগে ধর্মান্তর
এভাবেই হবে। তারা, মনে রেখো, আজ কেউ সাঁতার জানেনা,
জানেনা, কিভাবে হয় ওল্টাতে শরীর, ফের পাল্টি খেতে, দেখো হাসুহানা
গাছের কাছেই সাপ, তবু আমি খাই-হাগি, প্রভুত্ব ছাড়াই,
ঈশ্বর বিশ্বাস করে নীলাঞ্জনশান্তি পাই, চোখ মারলে তরুণী সাংহাই
দারুণ অস্বস্তি নিয়ে আমার চোখেও জলে অন্যকিছু, যদি নির্বাসন
দাও তবে চলে যাব, দৈবে মর্মমূলে বিঁধে আলেকজান্দ্রিয়া, মাসিডন ॥

অঞ্জনের ২য় কবিতার ৪র্থ লাইন 'রেদূ'—দূরে পড়তে হবে। নিশীথের ১ম কবিতার ১১শ লাইন 'তার' নয় তারই, ২য় কবিতার ১ম লাইনে এমন ভাবে, ১২শ লাইনের পর একটি আলাদা স্তবক, ১৫শ লাইনে গড়লোর জায়গায় পড়লো, এবং ৪র্থ কবিতার ২য় লাইনে চন্দনে হবে। শামশেয়ের ১ম কবিতার ৩৬ তম লাইনে 'নাচি' স্থলে লাচি, হবে। ধূর্জটির ১ম কবিতার ৮ম লাইনের শেষশব্দ আস্থাভিমানে হবে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

ইস্তাহার

দানিকেন পড়ে, পাপ শব্দটিকে কেটে দেবার কথা মনে পড়ে যায়। সেসময়ে
ভাগ্যিস চকিতগতিতে সাহিত্যের প্রতি মায়া আসে, বড়ো মন্দা সাহিত্যের,
না না, পাপ থাক। আহা প্রেম, আহা পাপ, আহা বোধ
কতোদিন ধরে কতো অক্ষরেরা ভক্তিমতী সালঙ্কারা মহিলার মতো
এদের প্রাঙ্গণে বসে শীতলা হয়েছে, ঘন্টাধ্বনি করে গেছে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে প্রাণে আর নষ্টামি সইবে না। ঈশ্বরবলির রক্তেই
বড়ো বেশি বমি পাচ্ছে, আহত বালক আর অন্য শব্দমাংসও খাচ্ছে না।
কশাই, গোপনে থেকো, নিজে মাংস খেয়ো না আর, বলি দেখিয়ো না,
তাহলেই ধর্মলাভ হবে—কিন্তু ওই দূরে পাগলিনী প্রশ্ন করে যাচ্ছে
'সবাই আছেন ভালো? বাসট্যাক্সিট্রাম আপনাদের ব্যবহার করছে নাতো?
তীর্থে যান পায়ে হেঁটে আজো—না হলে একদিন পৃথিবী পথহীন, একদিন
আপনি খঞ্জ—যে ভাবেই হোক, ভালো থাকুন—'

উন্মাদনা শব্দটিকে তাহলে কি ছেঁটে দেবো কোনো আধাসচেতনতায়
কোনো বাঁধা অচেতনতায়?
সে কর্মও কতো কাছাকাছি হবে ভবিষ্যৎ যন্ত্রসাহিত্যের?

ক্লিশে, তবু সব ক্লেশ নিয়ে, পুনরুক্তিবদাভাস হয়ে, মানুষ শব্দটি আসে
এরো পরে আমার লেখায়।

কবির প্রেম

বিচক্ষণ, ধূর্ত আর গন্ধর্বরাজার সব উপাখ্যান শেষ, শেষ রাত্রি নীল।
আহত নৃত্যের মতো পড়ে আছে ছন্দোভঙ্গি, মৃত্যুর মণ্ডন—
নিরক্ষরতার দোষে সুগভীর চিত্ররাজি অতিবর্ণাঢ্যজীবিত
ন্যায়চৈতন্যের মধ্যে ছায়ারমণীর মতো সাঙ্গীতিকতাও
এক রাত্রি যাপন করছে। এই সব সমাহার বল্মীকের মতো হয়ে আছে;
কিন্তু কোনো জলকন্যা কৌতূহলে বিঁধিয়ে দিয়েছে তার কাঁটা

জানা গেছে, স্বাস্থ্যচিহ্নময় রক্ত হয়ে উঠতে মনীষার আজো বাকি
সময় এখনো অধোমুখ।

শব্দ, বিস্ফোরণ শেষ করো, সঙ্কুচিত হও প্রেতশরীরের মতো
নত হও মৃত হতে থাকো
তোমাদের পক্ষে সেই কবিবালকের নারী আশ্চর্য চিত্রের ;
বর্ণমেধা, রেখা ভাঙো, আলোকগ্রাহ্যতা ভাঙো,
চিত্রিত হবার পক্ষে সেই নারী ছন্দসংকটের মতো শ্বেত
রেখার কল্পনাদ্বন্দ্বী, অদৃষ্টের মতো তার কালো কেশরাশি
শুধু অনভিজ্ঞতায় তাকে পাওয়া যাবে ; বোসো, অভিজ্ঞেরা
বাইরে, উৎসবের শোকে, নতমুখ, ভগ্নপদ, দেখে যেয়ো জড়িতমৃত্যুকে
আজ তোমরা মিষ্টান্নের প্রত্যাশী ইতর।

ক্ষুব্ধ যুবকদের জন্যে

হাসি হাসিমুখে তাকিয়ে থাকলেন আমার প্রেমিকা
ডেন্টিস্টের মতো—
নড়া, পোকায় খাওয়া দাঁতের মতো বাবা মাকে তুলে ফেলতে হবে,
আজ্ঞা পেলেই করবেন।

তাঁর বক্তব্যে আমার কোনো সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই এ প্রসঙ্গে যে
এক জীবন এঁরই জন্যে ঢেলে দেওয়া যায় কি না,
কিন্তু আমার ছেলে একদিন দেখতে চাইবে ব্যাঙব্যালান্স, প্রতিপত্তি—
তাকে হয়তো সংস্কার কাটিয়ে জানানোও যাবে
প্রেমমূলক বিয়ের জন্যে এসব একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ;

সে যদি তখন দেখায় এটাও নড়া দাঁত, পোকায় খাওয়া,
তুলে ফেলতে হবে—
হয়তো তুলে ফেলবোও তার মুখের দিকে তাকিয়ে,
কিন্তু, একমরণ কি তারই জন্যে ঢেলে দেওয়া যাবে ?
পিতৃপুরুষ হয়ে, তেমন কোনো কাজ যে অনুচিত।

রোগশয্যায়

ফর্সা, শীর্ণা, কালো শাড়ি, পাশে কাটা ফল, আর
তোমার ভিতর থেকে উঠে আসছে দক্ষিণের ডাক্তারখানার
মার্জিত ওষুধগন্ধ—
ডেটলের বড়োই অভাব।
একটু ঘেন্না হতে একটা চুমু খাই, বিগত স্নেহের জন্যে স্নেহ নিয়ে,
আরো একটা।
ও তুমি অধৈর্য, কয়েকটি কথা চাও, কাটা ফলের টুকরো
এখনি ফেলবে খেয়ে, তাই পাত্রে কথাই সাজাবে—বাইরের কথা নয়—
সেসব অস্বাস্থ্যকর।

হঠাৎ এমন রোগ ধরলো তোমায়, য়্যাঁ, এমন হঠাৎ
আজকালও কিছু ঘটে ! এসব দেখেই আশা হয়
কৌতূহল হয়, রোগ ঠিক কখন দেখেছে। রোগের কি ভীষণ ক্ষমতা
আমিও তো ক্রমশই ফর্সা হতে চাই, প্রেতপাণ্ডুরের মতো
লোভী আগুনের মধ্যে মূর্খকাঞ্চনের মতো, কৃতকীর্তিজীবী
খানিকটা হয়েছিও, পৃথিবী আমাকে অল্পশর্করার
কয়েকটি কাটা ফল ইতোমধ্যেই দিয়েছে, আরো দেবে
আরো বেড়ে যাবে হুহু করে শব্দের ক্ষমতা, অনির্বচনীয় ব্যাধি
তুলো না আঙুল, শ্যামস্বাস্থ্য নিয়ে তখন বলো না
ধূপগন্ধ নেই
একটু স্নেহ হলে একটা চুমু খেয়ো, বিগত ঘৃণার জন্যে ঘৃণা নিয়ে,
আরো একটা।

কলকাতা

গ্রে স্ট্রীটের সেই হস্টেলে, আমি ফিরেছিলাম অনেকদিন পর—
যখন কলকাতায় কবির গান আর বেকার ছাড়া কোনো খবর নেই
পূর্বদিকে তাকালে এখনো দেখতে পাওয়া যায় পুরোনো উত্তর কলকাতা
গঙ্গা, অজস্র সরল ছেলে, সরল চাকরির আশা, শ্মশান ও পাশাপাশি
মন্দিরে বীভৎস দেবতা।

প্রথম যখন আসি, আমাদের সহপাঠীটি ছিলো অমায়িক,
প্রায়ই প্রেমে ব্যর্থ হতো সে, ড্রপ দিতো পরীক্ষায় ; আমরা
তখনো পর্যন্ত তর্কের বিশ্বাসে আছি, কলকাতার বিশ্বাসে আছি
মানুষের পাথরভাঙার মূর্তি প্রত্যেকের মনে আছে, দারুণ সম্পদে
দারুণ বিপদে বেঁচে তখনো আমরা যাই তার হস্টেলের ঘরে—
মণিহার ছবিটির গান বেজে যায়।

এখন সে হস্টেলে অন্য এক কবিবন্ধু—প্রায় সাতবছরে
ক্রমশ কমেছে কথা : তার পদবন্ধে রূঢ়রুচি
গ্রীষ্ম কিংবা তীব্র শীতপরিহাস : সে খেতে ও খেলতে ভালোবাসে
কিন্তু কলকাতার ধোঁয়া বড়ো ভারি, চামিনারও চুপসা থেকে
তিনগুণ উঠে গেছে। এখনো বিশ্বাস আছে
মরবার অক্ষমতা আমাদের কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখবে।

আসলে, সেসব দিনে, আমরাই বহু ভুল করেছি। দেখিনি
দক্ষিণ কলকাতার চকচকে বাজপথ, এ্যাফ্লুয়েন্স,
শাদা আরশোলার রঙের রক্তময় পদবন্ধ, স্নিগ্ধ ছুরির মতো মানুষের দাঁত
লোমহীন নিতম্বের মতো তাঁদের আর্থিক সিদ্ধি—বিয়েবাড়ি, পাশাপাশি
মডেলিং করা কোনো মহিলার সংগৃহীত দুর্লভ কুকুর, যারা দম্পতির থেকে
বেশি খ্যাত—

নির্বাচন করে নিতে হবে, দু নৌকায় পা রাখলে বড়োবাজার আছেন।

স ভা পৃ থি বী তে

এই শোনো, খুব জরুরি কথা আছে—সে জানে কি কথা, তাও
সরল অজ্ঞতার মুখ বাড়িয়ে দিলো—তোমার সাহস
দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে : এরকম হতে থাকলে
আসবো না, একি, কোনো কথা নেই !

পূর্বপুরুষেরা নাকি বিব্রত যোষিদ্‌মুখ দেখে
বিমুগ্ধ হতেন, মনে করে আমি অনুগত হালকা ঠাট্টায়—

এ কি কথা নয়, কিন্তু দেখো, এসব বলার মতো
উপযুক্ত বাংলা ভাষা নয়, কিংবা কোনো ভাষা হতেই পারেনা—
ক্রমশ সরছিলাম, একারণে একসময় জ্বলে উঠলো শরীর
বিস্ফোরণমুহূর্তের আগের দ্বিধার প্রান্তে সরে গেলো সে—
ছি ছি, শুধু এই চাও ? শুধু এ ঠিক চাইনি, কিছু টাটকা হাওয়া
কিছু রোদের মতন রোদ নদী সমুদ্র গোধূলি
কৌতুক করুণা আর প্রতিশোধে মানুষের রূপময় মুখশ্রীর পাশে

যুবকের মেরুদণ্ড বালকের মুখ নিয়ে শুভ্রহাস্যে রক্তিম আহ্লাদে
বিশাল খেলার মধ্যে আমিও চেয়েছিলাম যেতে, মনে আছে।
কে জানতো সেগুলোও কবির প্রার্থনা
তাই অসম্ভব : কপর্দকহীন ছাড়া বারবার আর কার আঙুলে
লক্ষ্মীর মোহর উঠে আসে ?
এই শোনো, খুব জরুরি কথা—সে জানতো, কি কথা, তাও
সরল অজ্ঞতার ভঙ্গিটি ফিরিয়েছিলো—তারও তো সাহস
স্পর্ধায় পৌঁছেছিল একদিন, যার জন্যে পৃথিবী চুরমার।

বসে থাকো অভিজ্ঞানহীনা, বসে আছি আমি নষ্ট স্মৃতি, শুধু বিভ্রমের মতো
শরীরে বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝলকে উঠবে, শূন্যে, ক্ষুরধার।

জ রা ভা র

'জানেন, একবার ছোটোবেলায়—' এরকম কেউ বলে উঠতে চাইলে আমরা
থামিয়ে দিলাম তাকে, অভিমানে, ছোটোবেলা কেন কাছাকাছি এসে
একবার জানেন বলে না ?

সব গেলো। ও শহর, সব গেলো আমাদের
দেখো, আমাদের রৌদ্র সন্ধ্যা আমাদের সন্ধানী দুচোখ
নিভে গেলো। নাকি গেলো উইংসের ধারে ?
নষ্টপরিত্যক্ত পরিধেয় হয়ে আমরা কিন্তু স্টেজে পড়ে আছি
কৌতূহলী বালক দেখছে, সরিয়ে, সরিয়ে নাও !

'এসব কি লেখা হচ্ছে' ছায়াবান্ধবীটি এইবার প্রশ্ন তুললেন।
গ্রন্থছায়াভারনত মুখ, 'ফরাসী মনীষী একবার লিখেছিলেন, শৈশব তাঁর
কাছে ঘৃণ্য'—
'হুঁ, কিন্তু গ্রন্থ তাঁর প্রিয় ছিলো পবিত্র হিশেবে ; আমাদের কাছে
গ্রন্থ মানে নিবদ্ধকলঙ্করাজি, কামশূন্য সৌন্দর্যের সঙ্গে মূঢ় বাৎসল্যের
দক্ষিণসমুদ্রঅনিশ্চিতি,
মানুষীর চোখ তার সমাপ্তিতে নক্ষত্রের দিকে চায়—তা ছাড়া ছোটোবেলা
এ শব্দটি কখনোই শৈশব নয়,'
শুনে জলপ্রতিবেশী অল্প হাসলেন, 'স্বল্পতাই কিন্তু কোনো প্রবাহে অঞ্জলি।'
ছোটোবেলার কথামালা এভাবে বন্ধ হয়, হয়ে যায়
মানুষের জন্যে লেখার সময় ছিলো সেসময়
এখনো লিখি কি ? অসম্ভব. মানুষের ভবিষ্যৎ এশিয়া ও আফ্রিকার মতো—
স্নেহ করা যায়, মাত্র স্নেহ করা যায়, লেখা যায় কৌতূহলী বিশাল কেতাব
কোনো খণ্ডবাংলাদেশে বসে যখনি একটি লেখা শেষ করি—একটি ভিখিরি
কিংবা একটি যুবক
কিনারাবিহীনভাবে মরে যায়, মিটে যায়, স্নেহ আসে লেখায়, মানুষে।

ও নির্মম ছোটোবেলা, সব যাবে আমাদের, তুমি গেলে মঞ্চের আড়ালে।

শ্যামলকান্তি দাশ

মধ্যাহ্ন খুঁটে খায় দুটি পিঁপড়ে

ঘাস থেকে মধ্যাহ্ন খুঁটে খাচ্ছে দু'টি পিঁপড়ে
আমরা খাচ্ছি না—
রোদ ও পাথর জুড়ে আমাদের প্রভূত রয়েছে
তারই জন্য জীবনের যোগ্য হবো
রক্তিতে প্রকৃষ্টতম, সুগন্ধ, সুধীর !

প্রত্যাশায় গাছ বাড়ছে—ভিক্ষায় পিতাপুত্র
স্পর্শে বালিকার বিম্ব
আমরা খুব ছোটখাটো সৌখিন মধুর বলে
এভাবে বাড়ি না
আমাদের সমাজ ও সম্পদের ফুটোর সামনে
ঘাসের মধ্যাহ্ন বেড়ে পিঁপড়ের খাদ্য হয়
আর অস্পৃশ্য অতিথির চোখে ও চিন্তায় ঘুম
ঘুমের প্রান্ত জুড়ে এইসব স্পষ্টাকারে লেখা থাকে
আর সম্ভ্রমে গৃহীত হয়
মর্মখোলা দম্পতির শিল্প, দিব্যতা !

বচনাতীত

শব্দটি শুধু বোঝালে যুগল ঊর্দ্ধকমায়
বোধ্য এবং ঈর্ষাযোগ্য।
টের পেয়েছিলে তুমি।
হাওয়ায় হাওয়ায় মরে গেছে তারা
ধবল ফুলের মত
আমি ডুবজলে—ডুব দিতে ভুলে গেছি
শব্দটি কিছু উদঘাটিতও বটে—
হয়তো বাল্যে, অতল স্পর্শ, অর্জিত ছ'বিতেও !

ফেরার সময় অধিকার ছিল, আহা,
ফেরাতে লজ্জা, সম্ভবপর ছিল ?
কচিৎ বকের ইশকুল ভেঙে বিস্তর ভোরবেলা
কাছে এসে বলে
'আপনি আমায় বাঙ্ময় মত সমগ্র ডেকেছেন ?'
এখনো কি ডাকি ? ভুলের ওষুধে
চঞ্চল বেলা বাড়ে
ঊর্দ্ধকমায় সব ছিল যদি
বটের পাতায় ভেসে গেল কেন
বালমুকুন্দ হরি
বধির শব্দে শ্রবণাশ্রিত ঈর্ষা।

পতনে দৃশ্যে ভুল ছিল যদি শুধু
কেন আসন্ন, বাঁক নেয় কেন
টিটলাগড়ের গাড়িতে নাসিসাস।

সর্বনাশে তিনি

সর্বনাশে গুগ্‌লি খোঁটেন
চালশে ধরা চোখ
তিনি যতই ভালো লোক
হোন না কেন ভেতরে গেছো ইঁদুর
নোখাগ্রে তাঁর চোনা ছন্নমতি হিঁদুর!
খুঞ্চিপোষে তাঁর
ছাইভস্মের ভার
পেছনে ঝড়বাদলা
পরমার্থে হুমড়ে থাকলো
সাতটি কানা আধলা!
তিনি যতই কাটুন বেড
জটাজুটের জগন্মোহন
উপড়ে দিলো গেঁড়!
চারপাশে তাঁর বাঁধন
ওপর নিচে ফাঁদ
এখন বোরোবাঁধ
ভেঙে
ছলোচ্ছলো ঢেউ
মাখামাখির পর এখন
ঘুমিয়ে আছে ফেউ
বিলাসিনীর টায়রা
নোটন নোটন পায়রা
সর্বনাশে তিনি—
খোঁটনে তাঁর পাক খাচ্ছে
যদুকুলের চাঁদ!

রণজিৎ দাশ

স্বপ্নে পিতামহ

'তোমার যা কিছু আছে, এবার চুবিয়ে নাও লালবর্ণ মদে।
পুঁথিপত্র, হাতঘড়ি, যৌন-অহংকার, প্রেম, মিথ্যাবাদী ঠোঁট
সমস্ত চুবিয়ে নাও, ঘোর লাল নেশা দিয়ে সঞ্জীবিত করো।'
'এত মদ কোথা পাবো, হে মদ্যপ পিতামহ, বলুন আমাকে'

'মূর্খ তুমি, জেনে রাখো, তরাই জঙ্গলে আছে আমাদের উজ্জ্বল ব্রুআরি'

'অতো দূর যেতে হবে, কিন্তু কেন পিতামহ, গেরুয়া জলের সঙ্গ মন্দ নয়,
তবে কেন লালবর্ণ মদ?'

'সিম্বলিজম রাখো, কুলাঙ্গার, ট্রেন-ভাড়া ফাঁকি দিয়ে
চলে এসো তরাই জঙ্গলে!'

আরো কিছু রঙ্গ

পাঁক ও জঙ্গলে জাত এ জীবন আমাদের সম্ভ্রান্ত নাকের
ডগায় মাছির মত বসে থাকে; তাকে তাড়াবার জন্যে
গাড়ি থেকে নেমে আসে মহিলারা, গাছ থেকে নেমে আসে গরু
বৈশাখে উদাসী সঙ বাজায় ডমরু; জন্মের সংবাদ পেলে
হিজড়েরা নাচে, গায়, রূপোর মহাত্মা গান্ধী টাঁ্যাকে গুঁজে চলে যায়
দুর্গাপুর জেলে: সেখানে ইস্পাতমন্ত্রী ভাষণে জানান—
এঁটেল মাছির ভয়ে ভারতীয় স্টিলমুখোশের ব্যবহার
পূর্ব ইউরোপে খুব আদৃত হয়েছে। সমস্তই ভালো লাগে—
মহিলা, উদাসী সঙ, হিজড়ে ও গরু, শিক্ষিত ইস্পাতমন্ত্রী,
সমস্তই বোঝা যায়—গাড়ি বা গাছের থেকে নেমে আসা,
নাচ-গান, বৈশাখে ডমরুশব্দ, ভাষণে বজ্জাতি,
সবাই একটি ঠ্যাঙ তুলে আছে, ল্যাম্পপোস্ট পেলেই ভেজাবে!
আরো কিছু রঙ্গ আছে—যেমন কেরানী, তারা, শোনা যায়,
স্বপ্নে ছাখে—জল বা পাহাড় নয়—রেফ্রিজারেটার!

হেমন্ত আঢ্য

রাণীমার কাছে আত্মসমর্পণ

বাঁশের সাঁকোর ওপর শব্দকরে রাণীমা চললেন ঝিলে
থমকে পানকৌড়ী দুটি মট্‌মটি জাঙালের ধার থেকে
সরে এসে দাঁড়াল সাঁকোর তলায় এমন যে শ্বেতকদম্ব পা।

বিলোল ব্রীড়ায় ভেঙে খুলবে পায়জোর দুটি আড়ষ্ট লজ্জা
সইল না তাই তারা গুলঞ্চলতার ঠাণ্ডা ছায়ায়
সংগোপনে দাঁড়াল।

প্রতিবার বিশিষ্টতার মত এই ঘাটে দেখেছি
রাণীমা জলে নেমে গেলে চরাচরের শব্দগুলি
সঙ্গতি পায় আরো ভালো—
রাণীমার পায়জোর বাঁ-ধারে নিঃস্বনে ভাঙলে
জলপিপি, শালিখ্, গাঙ্‌শালিখ্ এমন কি যে—
হীরেমন পাপিয়া ঝাউয়ের ছায়ার সংগে
কলাপাতার মিল ঘটিয়ে নিল স্বরগ্রামে
বস্তুতঃ যে সব শব্দদের আমি লাখেরাজ রাজবাহাদুরের সভায়
মুখ চুন্‌করে পড়ে থাকতে দেখেছি তারা
দামাল পাড়ে বুঝিয়ে দেয় এখানে কেউ নেই গো
প্রান্তরে কেউ পাতা মাড়ালেই আমরা
ভীত ঝিঁঝি-র মতো থেমে যাবো।

রাণীমা যখন হেসে হেসে উৎসুক নিম্নমুখী
বেতসের পাশে জ্যোৎস্নার মত ম্লান করে এলেন
লুকোনো অমাবস্যার শরীরে—সেই দীঘি
লোকে যাকে বলতো ময়নার চোখ—
আমবাগান অশথতলা পীরসাহেবের কবর
মেঠোবাস — মাড়িয়ে পেরিয়ে গেলেন।

ঐক্যবান সৌন্দর্যের পেছনে আমি লুকিয়ে দেখলুম
তোমার জিহ্বা যোনি, সুঠাম অধোদেশের লোহিতাশ্ব ভীড়
কুরুবক চম্পকের মতো কতো কি উত্তিষ্ঠতি জ্যোতি
জলের বিস্ময় ঘিরে মৃদুশব্দে নেবে গেল
শব্দ শরীর ছায়া ডিঙিয়ে লাজুক পায়ের শব্দ করে
ক্রমে তিনি ফিরে এলেন আলোর কাছে ঋণী হবেন বলে।
আমি সেই দ্বিপ্রহরের সাহসী চোর যোনি ও জিহ্বার
তরে, শব্দগুলির ঐক্যতানে প্রাণভয়ে কামে
সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ করেছি তোমার, শুধুমাত্র গোপন সে
অধোদেশ—হেমকলসের মতো ওই স্তোকনম্রাদের পরিচয়
নিয়ে এক সাম্রাজ্যের ভীড় ঠেলে গিয়েছি
অনন্ত মূর্ছার স্বাদ জেনে নিতে।

এ ছাড়া আমার আর কোনো দোষ ছিল না।
রাণীমা গোপন বরাতের সাথে সাধ করে
মেধাগুলি উর্দ্ধদেশ লাফিয়ে পড়ে ঘিরে বলেছে
অন্ধকারে এই সুস্থির স্থলভাগ রেবারোধসি সুগন্ধ
এবং চারুশীলাদের ফেলে এই মোহময় বিশ্বপরিক্রমা
ছেড়ে অব্যর্থসাধন ফেলে অন্যগোলার্ধে জ্যোৎস্না দেখতে গেলে
তুমি পরবাস দুটি কুমীরের মতো হয়ে সতত আগ্রাসী
চন্দনের সাজানো চিতায় অগ্নিক্ষরণ দেখে হিমকণ্ঠ হয়ে বলি :
আমি তো কোনো দোষ করিনি রাণীমা।

কবিতা বন্দনা

লোকে তোমাকে পেতে নিজেকে দহন করে
আমিও করছি যেমন
কতটুকু আলো হবে তাতে—তুমি আছো আয়ত্তের শেষে।

অপচয় করার মতো শব্দ নেই আমার
এক অদ্ভুত মায়া, পুরোনো নীলাঞ্জন মাধুরী
আর মানুষকে মিশিয়ে—গল্পময়
শব্দের অগোছালে এক অদ্ভুত মন্ত্র পড়ে থাকে

এই 'তুমি'
কার্পেটে লিখে বাঁধাবো তোমায়।

পরে জেনেছি
তুমি শ্লাঘ্য তুমি মুদ্রিত অক্ষর, যৌনতার কাছে
এক অদ্ভুত যৌতুক
তুমি কিছু লোকের হীনমন্যতা কমিয়েছো
কিছু মানুষেরা তোমার বিশেষ ধরনকে ঘেন্না করে।

তুমি একের নিরঞ্জন, অপরের অঞ্জন
বাংলা সাপ্তাহিকে তুমি অদ্ভুত ঈর্ষনীয় হয়ে ওঠো।

তুমি অমেয় প্রমেয় সুখদা শ্লাঘ্য
লাইনোতে তোমার প্রতিমা
অদ্ভুত ঘামতেল পেয়ে চক্‌চক্‌ করে ওঠে।

চ ক্রা ন্ত

আমি একজন ভীত মানুষ অহংকারী
দ্বারকনাথের সুদর্শন আমায় খুঁজে
বেড়ায় ত্রিভুবন
আমি আলোছায়ায় থাকি
পালিয়ে বেড়াই
এমন সময় পথ বাৎলে দিল স্নায়ু
হাল্কা হয়ে
সুদর্শন কাটে নাকো আরোহী করে
ঘোরায় এবং মারে
যাবজ্জীবন ধরে

ওরে মূর্খ
পরিধি থেকে মধ্য বিন্দুতে যা
ঘোরা অনেক কম হবে
তবে একেবারে থেমে যাবে না।

তবে এই কি উপদেশ শেষ
শেষ থেকে সুরুতে যাই
অথবা বিশেষ থেকে নির্বিশেষ
পিছল পায়ে আমি যে পলাতক
শূন্য আঁকড়ে ধরি মুঠিতে
চক্রান্ত থেকে ক্রমে, ওই

রহস্যময় অঙ্গুলির নির্দেশে যাবো!

সা প

শীতকাল শেষ হয়, গ্রামে তার গোলাবাড়ী
পুরোনো বাস্তু সাপ তার পূর্বপুরুষের মতো বয়সী
খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

প্রথম বর্ষা হলে মরাই-এর পাশে রাখা খড়ে
ব্যাঙ ও ইঁদুরের জন্য অপেক্ষা করে

পুরোনো বৃদ্ধ-সাপ, শরীরে শঙ্খ দেখে চেনে
এতো নিস্তব্ধ শঙ্খ-চিহ্ন শরীরে
ও বাস্তু-সাপ, লতা! লতা! লক্ষ্মী যাবে
যদি ঘা-পায় ওর সাথে

ইদানীং শহরে উন্নতি—নানা সর্প মারা যায়
সরকারী লোক এসে গর্ত্ত খুঁজোয়
কার্বলিক এসিড ঢেলে দেয়।

সাপ মারে এক ক্রুদ্ধ বিশ্বাসী, তার ছেলেকে সাপে
ছোবল দিয়েছিল ; সে হতে চায় চন্দ্রধর—অন্তত জন্মেজয়

আমি কী কামড়াবো ওকে, ফোঁস করা দরকার
এ সব চিন্তার আগে মাজা ছুঁয়ে লাঠি নেমে আসে
আমি তো স্বভুক্, তবে লাঠি কেন এতো নির্মম হয়
ভগ্ন কাঁকাল—রক্তক্ষণা হয়ে ভাবে।

এদিকে রাত্রি : জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে জড়ে
ভয়াল ময়ালের মতো বাড়ে ; লীলা খেলা শেষ হবে
—এই সর্পে ঘা-দাও যদি তুমি
বৈনাশিক সংসারে সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

মৃত্যু

তোমাতেও চোখ রাখি, প্রাচীনে যা কথিত রূপান্তরের খেয়া
যেন জলভ্রমি উৎসুক পাখী অকস্মাৎ হৃদয়ের বীতংস
ভেঙে ঝরে যায় ওই নীল রসাতলে

তাকেও শোনায় ফুটে ওঠে যা তাই কুসুম
স্ব-গন্ধে সুগন্ধ হয়ে থাকে, জানে পীড়িতক অঙ্গুলি এসে
অন্ধ করে দেবে হলুদ রোদের বন্যা
লাবণ্যের সাথে অনাদিকেতকী পরিমল
অথচ ছিন্ন বেদীমূলে পূজা হয় নাকি অথবা ছিন্ন মৃণাল ঘিরে
একটি অব্যর্থ কুসুম

মৃত্যুর পরে শুরু হবে পূজা জন্মযৌবনকালে সে কথা শোনাবো কেমনে

সেই নিষ্ফল ক্রোধ সর্বংসহা হয়ে যায়
রক্তের মধ্যে খেলা করে ঝড়
আকাশের মতো অনাদি শান্ত হয়ে যায়।

অমিতাভ গুপ্ত

শ্যামসমান

ভালবাসা না পেয়ে আমি বহু উন্মোচনহীন প্রয়াস সয়েছি, যেন অশিষ্ট আঙুলে বিষের মোড়ক খুলে ফেলা, মিশিয়ে নেয়া প্রিয় পানপাত্রে। অনন্তকাল অবধি এমন অস্থিরতা বহন করা সম্ভব হত তাই সেদিন আমারই চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ল এক অস্পষ্ট সঞ্চারী ছায়া, বিস্তৃত হল মেঘের গভীরতা থেকে উঠে এসে ভূমিগর্ভ পর্যন্ত। মৃত্যুর কথা মনে পড়ে গেল আমার। সেদিন আশ্রয় নিয়েছিলাম ছিন্নভিন্ন দেশান্তরের রাতে এক নিরাবলম্বনে। তার পূর্বে, বহে গিয়েছিল হাহা ঝড়, বিদ্যুৎদীর্ণ আকাশের অসহিষ্ণুতা ও গর্জিত প্রান্তর পার হয়ে হয়ে আমি এসেছিলাম পূর্ণ নিরাশ্রয়তার দিকে। সেখানে শ্বাপদ ও ভ্রমরেরা একসংগে বিচরণ করে, পাহাড়ের বিম্বে পড়ে ভয়াল ওষ্ঠের ছায়া।

তৎক্ষণাৎ বজ্রধ্বনি শোনা গেল। নিরঞ্জন দু'টি পদচ্ছাপ অনুসরণের জন্য ময়ূরের কর্কশ কণ্ঠস্বর মেঘপুঞ্জ স্পর্শ করে পুনরায় বিদ্যুতে বিভ্রমে জলধারে ধূলিকণায় পাথরে কটিতে মৃদংগে ও পশুর লাস্যে ফিরে এল, যেন এক অন্ধমেয়ে কক্ষেকক্ষে কক্ষান্তরে খুঁজে ফেরে অপহৃত কৌস্তুভ তার। মনুষ্য শবের ভস্ম উঠে আসে চারিপাশ থেকে। উদ্‌ভ্রান্ত অলক্ষ্য বাতাসে দেখা দেয় মৃগদল যাদের চিত্রিত দেহে তৃণবিনাশের চিহ্ন লেগে আছে।

আমার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যায়।

মৃত্যুকে দেখেছি আমি এইভাবে কোনদিন মেঘমগ্ন তরুচ্ছায়ায় কিংবা তরুমূলে এলায়িত, অশ্রুময়ী রমণীর স্রস্ত কুন্তলের মতো। অসম্ভব অবিশ্বাস্য হাসি হেসে ভুলে যাই সমস্ত আক্রোশ। মৃত্যুকে দেখেছি আমি কপালের স্বেদবিন্দু মুছিয়ে নেয়ার মতো ভংগি করে ভুলিয়ে দেয় অকারণ অপমান। একশত বৎসর পূর্বে যে নারীকে কামনা করেছি আমি, যে আমাকে জানিয়েছে সুখহীনতার কথা, দিয়েছে জীবনোচ্ছ্বাস : তার সেই

সহানুভূতি এমন প্রবল ছিল যে আমার দেহচক্রে এক আকস্মিক বিপর্যয় ঘটে যায়। আমি তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে দেখি, সে চলে গিয়েছে। পারম্পর্যহীন এই প্রেম শুধু দীর্ঘায়ত করে রাখে আমার মৃত্যুকে। তার বিবাহবাসর থেকে আমার নিজস্ব মেয়েমানুষের যোনি পর্যন্ত ভালবাসা অবচ্ছিন্ন মরীচিকার মতো দুলে ওঠে। সে এক অখ্যাত মৃত্যুর ইতিহাস। এইসব ব্যক্তিগত মৃত্যু, যেমন মৃগদলের উদ্দেশে তৃণরাশির ও ব্যাদিতপেশী সিংহের উদ্দেশে মৃগের, আছে বিশ্ব-চরাচরে চিরকাল। রচিত হয়েছে চকিত অমঙ্গল, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কোটি জীবদেহ, তবু তাও বাঞ্ছনীয়, যেমন আকাঙ্খা করে সূর্য সূর্যগ্রাস, উৎকর্ণ পারিজাত ভ্রমরগুঞ্জন শোনে, ভূমি চায় প্লাবনপীড়ন।

তবু আরো মৃত্যু আছে। সব মৃত্যু কৃষ্ণের চোখের মতো প্রিয় নয়, মোহময় নয়। কখনো মুরলীধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায়, শুধু শূন্য, উচ্ছিষ্ট আবিল শূন্য করোটির মতো পড়ে থাকে। বিভ্রান্তের মতো আমি যে কোনো মৃতর ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখি। সে আমার প্রথম চুম্বন।

এইভাবে, মৃত্যুর অনেক আগে মৃত্যুর অস্বস্তিগুলি আমাদের জেনে যেতে হয়॥

অনুবাদঃ ঈশোপনিষৎ

পূর্ণ হয়ে আছে পৃথিবী, পূর্ণতা যেখানে মেলো চোখ, যাকিছু আছে সব পূর্ণময়, শুধু পূর্ণ বাকি থাকে পূর্ণ হতে যদি পূর্ণ তুলে নাও।

যাকিছু চঞ্চল জগতে, প্রাণময়, সকলই পূর্ণের স্পর্শে সার্থক
পূর্ণ হতে থাকে যেটুকু অবশেষ, গ্রহণ করো, লোভ মিথ্যা সম্পদে।

কর্ম করে যাও দীর্ঘজীবি হয়ে, যেমন অভিরুচি আয়ু ও কর্মের
আত্মদর্শনে বিমুখ হয় যারা তাদের পরিণাম আত্মহননের।

সূর্যহীন, গাঢ় আঁধারে আবৃত অন্ধলোকে মূঢ় মানুষ বাস করে
আত্মদর্শনে বিমুখ হয় যারা তাদের পরিণাম আত্মহননের।

মনের চেয়ে দ্রুত অবাধ গতি যাঁর, কখনো স্থির তবু কখনো গতিশীল
জানেনা কেউ তাঁকে জানেনা ইন্দ্রিয়, কর্ম ঘটে শুধু তাঁরই করুণায়।

কখনো গতিময় কখনো নিশ্চল, কখনো কাছে আর কখনো বহুদূরে
সবার অন্তরে গোপনে, তবু তিনি সবার বাহিরেও নিত্য রয়েছেন।

বিশ্বে সবকিছু যখন আত্মার ছায়ায় বিম্বিত, আপন আত্মায়
সবার ছায়া পড়ে, তখন মনে হয় হৃদয়ে নেই কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ।

নিজের আত্মায় বিশ্ব আবৃত, সর্ববস্তুর গভীরে আপনাকে
জানেন যিনি তাঁর মোহ বা শোক নেই, সবই এক, নেই তুচ্ছ ভেদজ্ঞান।

কালের বিভাজন তিনিই করেছেন, বিদেহী তিনি, তাঁর ক্ষত বা পাপ নেই
কবি ও মনীষীর মতন সৃষ্টিতে সতত উদ্বেল, অবাধ জ্ঞানবান্।

অন্ধ তমসার ভিতরে ডুবে যায় অবিদ্যায় যার নিত্য উপাসনা
সেরূপ অভাজন, কর্মহীন জ্ঞান অধিক আঁধারের গর্ভে টেনে নেয়।

বিদ্যা ফলদায়ী, কর্ম দান করে পৃথক ফল, এই ফলের ভিন্নতা
ব্যাখ্যা করেছেন ধীর ও ধ্যানী যাঁরা চিন্তাবিদ্ বলে সদাই আদৃত।

সভয় সাধনায় মগ্ন যেইজন জ্ঞান ও কর্মের করেন উপাসনা
কর্মশেষে তাঁর মৃত্যু পার হয়ে অমৃত লাভ হয় জ্ঞানের মাধ্যমে।

অন্ধ তমসায় চরম গতি তার যে করে শুধু জড় বিষয়-অর্চনা
কর্ম-ভজনায় আত্মহারা হলে একই গতি হয় আঁধারে অন্ধের।

মরণসম্ভব কর্ম আছে কিছু, কিছু বা আছে এই জগতে চিরায়ত
উভয়ে এক নয়, বরং বিপরীত ফলের প্রদায়িনী, ধীরের চিন্তায়।

নিখিলসৃষ্টির এবং কর্মের সাধনা একসাথে, এরূপ সদাব্রত
কর্মে মৃত্যুকে করেন লঙ্ঘন, এবং অবশেষে অমৃতভোগী হন।

হে দেব, দ্যুতিময়, হিরণপাত্রের আড়ালে সত্যকে করেছ আবৃত
উন্মোচন করো মিথ্যা-আবরণ, দেখাও সত্যের পরমপ্রিয় রূপ।

হে দেব, দ্যুতিময়, রশ্মি করো ম্লান, তোমার কল্যাণময়ের মতো রূপ
দেখাও একবার, আমার গভীরেও তোমার আত্মার দীপ্তি লেগে আছে।

মৃত্যুহীন ওই বায়ু ও অনিলের নিকটে লীন হোক এ'দেহ-অবশেষ
যাকিছু করা হলো স্মরণ করি সব, তুমিও স্মরণীয়, মন্ত্রধ্বনিময়।

হে দেব, দ্যুতিময়, তোমার জ্ঞাত সব, তুমিই বিশ্বের সবার চেতনায়
পরমমঙ্গল পন্থা করো দান : আভূমিনত করি তোমার বন্দনা।

মন্তব্য ও পাদটীকা॥ উপনিষদের কবিরা বাস করেছিলেন বালকের জগতে, অপুষ্ট ও বিশ্বাসময় চেতনাকে অবলম্বন করে তাঁদের কবিতা স্পন্দিত হয়েছিল। তবু আরো কিছু আছে। হয়ত, বক্তব্য নয়, ধ্বনিমাধুর্যই তাঁদের রচনাকে বেগবান্ ও কালোত্তীর্ণ করেছে। একশ বছর আগে এদেশের কবিরা উপনিষদ্ শিক্ষা করতেন দার্শনিকতা আহরণ করবার জন্য। এখন কোনো তরুণ কবিযশোপ্রার্থী উপনিষদ বা প্রাচীন সাহিত্যের অন্য নিদর্শন ও পাঠ করবার চেষ্টা করেন অপ্রচলিত শব্দসংগ্রহের ঝোঁকে। তবুও তো পাঠ করা হয়। অবশ্য আমরা সূর্যকে আর ঈশ্বরের মুখোশ বলে কল্পনা করে নিতে রাজি নই। বরং ক্ষয়িষ্ণু সূর্য আমাদের সচেতন করে তোলে আসন্ন শীত মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে। বরং আমাদের চোখে পড়ে সূর্যের রশ্মি এই পৃথিবীতে সমভাবে আর বিকীর্ণ হয় না, কেননা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ তুলেছে অট্টালিকা, যার কুৎসিত ছায়া গরীবকে উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত করে, এমনকি শিশুরাও রৌদ্র পায়না।

ভাষান্তরে যে স্বাধীনতা গ্রহন করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ঈশ শব্দের পরিবর্তে দ্বিতীয় স্তবকেও পূর্ণ শব্দটি ব্যবহার করায়। শেষের দিকে পূষণের পরিবর্তে দেব দ্যুতিময় করা হয়েছে এবং মূলকে উপেক্ষা করে তা পুনরুচ্চারিতও হয়েছে। ছন্দের ক্ষেত্রে সাতমাত্রায় পর্ব বিভাজিত, যাকে রবীন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দের বাংলা রূপান্তর বলেছেন এবং যার ব্যবহার বুদ্ধদেব বসু ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। বর্তমান অনুবাদকের মনে হয়েছে, উক্ত ছন্দবন্ধনে সংস্কৃতকাব্যের কোনো কোনো সুর দূরবর্তীভাবেও ধরা পড়ে। অন্ত্যমিল দেয়ার চেষ্টা করা হয়নি, বাংলা ছন্দে সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে' এরূপ অনুমতি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন॥

.....

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

আত্মপ্রকাশ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে

.....

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর

কবিতার বই ★ কফিন কিংবা সুটকেশ

উলুখড় কর্তৃক প্রকাশিত। সিগনেটে পাবেন

.....

কবিতা সিংহ সম্পাদিত

১৭ জন তরুণ কবির ৫১টি কবিতার সংকলন

সপ্তদশ অশ্বারোহী

এখনো কিছু কপি সিগনেটে পাওয়া যাচ্ছে

ক বি তা র আ মি' স ম্ব ন্ধে

দীর্ঘ আলোচনা এ সংখ্যায় করা যাচ্ছে না, জায়গা কম; তত্ত্বাবধায়কদের পক্ষ থেকে আমরা লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা তিনি চালিত হননি বলে। বাংলা পদ্যের অতিচর্চিত 'আমি'র প্রসঙ্গে কোনো কোনো কথা জেগে উঠছিল: শঙ্খবাবু এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জবাব দিয়েছেন, সতীর্থদের ভূমিকা স্পষ্ট করার একটা চেষ্টাও করেছেন। যদিও, তাঁর নির্দিষ্ট স্বাধীনতা পরবর্তী তরুণ মানসিকতা সম্ভবতঃ আরো পরে বাংলা পদ্যে নাগরিক ঘূর্ণিনেশা নিয়ে এসেছে। আত্মজৈবনিকতার সূত্রে লেখকের নাম পদ্যে গদ্যে ব্যবহৃত হবার ঘটনা, লেখকের সদভিলাষ থাকলে, শঙ্খবাবুর কথার যাথার্থ্যই প্রমাণ করবে, কিন্তু এই ব্যবহার মাত্রই সততা বোঝায় না—আমরা এই রেওয়াজকে ফাঁকা চাতুর্য বলতেও ক্লান্ত, দুবার বা কয়েকবার নাম ছাপানো ছাড়া আর কিছুই, কোনো কোনো জায়গায় বোঝা যায়নি। ঠাণ্ডা মাথার গণিত, পরিসংখ্যান ও অভিমান নিয়ে কবিরা নরকের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে আসবার সময় রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের উল্টো দিক হয়ে উঠছেন—দুটি কারণে আমরা এ ধারণায় মিললাম না। নাগরিক চোখে ভারতবর্ষের উত্তর স্বাধীনকালের অভিজ্ঞতা নারকীয় নিশ্চয়ই; ও, একজন কবি, নিশ্চয় শুধুমাত্র নাগরিক নন! রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব এখন আমাদের কাছে নিরুপায় ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক: শঙ্খবাবুর কথিত তরুণ কবিরাও তাই। অতর্কিতে আমরা জানলাম কবিরা এখন সকলের দীনতা / আকাঙ্ক্ষায় সমভাক্: সভ্যতাশ্রী বদলাবার দায় আর তাঁদের নেই। কিন্তু দায়িত্ব বা মহত্ব তো কোনো গজদন্তমিনার নয়। সবেতেই যদি টান থাকে, তবে একজন কবি কিভাবে জানতে পারেন, যে ঠিক "বিচারবিশ্লেষণটি" তাঁর নয়, কূটকচাল টানাপোড়েন তাঁর নয়? পথ না হোক, এগুলো তো বিপথ বটে। যে কবি শিল্পীদের যশ অনুযায়ী মদ্যপান করে থাকেন এই জেনে যে এটি বিপথ—এতেও তাঁর টান থাকা উচিত; কিন্তু শিল্পশাস্ত্রটি সচেতন হয়ে এড়িয়ে যান, আর যাই হোন, তিনি সর্বাস্তিবাদী কি? পাঠকের জন্যই কিন্তু ইতরী কৃত হতে হয় কবিকে, আর হয়তো প্রতিবেশী মেধার এই চরিত্রটির বিরুদ্ধেই তাঁর শেষ অস্তিত্ব।

শ ঙ্খ ঘো ষ

ক বি তা র আ মি

প্রায় বারো বছর আগে, নতুন সময়ের তরুণ কবিদের নিয়ে যখন চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে পাঠকসমাজে, কবিতার অনুরাগিণী এক পাঠিকা বিলাপ ক'রে উঠেছিলেন এই ব'লে: 'দিনে দিনে কী যে হলো! ছেলেমানুষ কবিরাও আজকাল চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলে! কী ক'রে যে এত সাহস হয় ওদের!'

বোঝা যায় যে আরো অনেকের মতো এই মহিলারও মনে শুদ্ধ কবি-চরিত্রের একটা আদল তৈরি হয়ে ছিল, তিনি ধ'রেই নিয়েছিলেন যে কবি হবেন নম্র, লাজুক, ভদ্র; চোখে চোখ পড়লে সহজেই নামিয়ে নেবেন চোখ; এবং মহিলাদের সামনে প্রাচীন সম্ভ্রমে নত থাকবেন সব সময়ে। কিন্তু এটা মানতে হয় যে কোনো কোনো তরুণ সেদিন এই চরিত্র থেকে স্পর্ধিত ভাবেই নেমে এসেছিলেন অনেকটা। নেমে এসেছিলেন, কেননা কবির জন্য স্বতন্ত্র কোনো বেদীর দরকার আছে ব'লে মানেন নি তাঁরা, দ্রষ্টা কিংবা ত্রাতার ভূমিকায় কবিকে আর দেখতে চান নি তাঁরা, তাঁদের মনে হয়েছিল যে কবিও আর পাঁচজন মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার মতো মানুষ, কোনো পৃথক মহিমার দাবি নেই তাঁর। তাই পথচলতি একজন মানুষ চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বললে সেটা যদি বিশেষ ক'রে উল্লেখ করবার মতো সংবাদ না হয়, তবে কবির চোখ এমন কী অপরাধ করল, তা অভিযুক্তেরা বুঝতে পারেন নি সেদিন। চোখে চোখে তাকিয়েই সেদিন তাঁরা জেনে নিতে চেয়েছিলেন কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিধি, নিজেদের চারপাশের সংস্থানের মধ্যে নিজেদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে দেখে নিতে চেয়েছিলেন তাঁরা, আর এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল নবীন এক 'আমি'র উত্থান। কবিরই জীবন তখন এসে পৌঁছল কবির সামনে, কবিতার প্রধান এক বিষয় হয়ে উঠল তাঁর 'আমি'।

কিন্তু এই 'আমি' কি নতুন এল কবিতায়? বাঙলা কবিতাতেই কি এই আমি একশো বছরের পুরোনো নয় আজ? অনেকেরই মনে ইতিমধ্যে হয়তো জেগে উঠছে কোনো-কোনো প্রসিদ্ধ লাইন: 'আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম / শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম!' অথবা, আরো

নিশ্চিতক্ষণে, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ / চুনি উঠল রাঙা হয়ে!' তাহলে, বলা কি যায় না যে আমি-র জাগরণ ছিল রোম্যান্টিকতারই কুললক্ষণ? তার জন্যে কি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবার দরকার ছিল কোনো?

ঠিক; প্রথমে মনে হতে পারে যে তার কোনো দরকার নেই। কিন্তু কবিতার মধ্যে একটু এগিয়ে এলে হয়তো আমরা ধরতে পারব যে এই আমিরও আছে গোত্রান্তর, রূপান্তর; হয়তো একই অর্থে রবীন্দ্রনাথ আর আজকের কোনো তরুণ কবি 'আমি' শব্দের উচ্চারণ করেন না, হয়তো এই শব্দের দোলাচলের মধ্যেই বাঙলা কবিতার কয়েকটি পর্যায়বদলের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

লিরিক্যাল ব্যালাডস্-এর ভূমিকায় একদিন বলা হয়েছিল যে কবি হবেন a man speaking to men। কিন্তু একথা ব'লে কবিকে আর তাঁর পাঠককে ঠিক একই আসনে বসানো হয় নি সেদিন। এই শব্দবন্ধে একই শব্দের একবচন আর বহুবচনের প্রয়োগ—man আর men—নিতান্ত অকারণ নয় নিশ্চয়। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়': জীবনানন্দের এই লাইনটিতে দুটি সমার্থক শব্দ যেমন ব্যবহারের গুণে অনেকখানি ভিন্ন তাৎপর্য পেয়ে যায়, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ওই সূত্রটিতেও তেমনি এক ভিন্নতা উদ্যত হয়ে আছে। ব্যক্তিগত মানুষ নয়, তার ভিতরকার সত্তাপ্রবাহ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় বলা যাক তার comprehensive soul বা spirit of life, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন কবি। আর এই কবি, ভিতরকার এই মানুষ যখন কথা বলেন, কার সঙ্গে কথা বলেন তিনি? কেবলই কি বাইরের পাঠকসমাজের সঙ্গে? 'কবিতার তিন স্বর' প্রবন্ধে এলিয়ট বরং আরেকটু খুলে বলেন এর উত্তর। কবির আমি কখনো কথা বলে ব্যাপক শ্রোতৃমণ্ডলের সঙ্গে, কখনো সেই আমি হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র কোনো নাটকীয় চরিত্র, আর কখনো-বা কবির আমি কথা বলে কবিরই সঙ্গে, তাঁর নিজের সঙ্গে।

নিজের সঙ্গে নিজের এই কথা বলাও অবশ্য তেমন নতুন কোনো ব্যাপার নয়। এই কথা-বলা, এই খেলা-করার ধরনটা বুঝে না নিলে তো অস্পষ্ট থেকে যায় রবীন্দ্রনাথের এসব কবিতার লাইনও: আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা! কিন্তু, এইখান থেকে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই দ্বিধা বা ত্রিধার ধারণা থেকেই দেখা দিতে শুরু করে কবিতার জটিলতা, কেননা সাধারণ পাঠক হিসেবে আমরা নিজেদের অনেক সময়েই ধরে নিই সামঞ্জস্যময় আত্মসম্পূর্ণ মানুষ, গোটা একজন মানুষ, অনেক সময়ে আমরা ধরতেই পারি না কতখানি টুকরো টুকরো হয়ে আছে আমাদের সব-সময়ের অস্তিত্ব, যে-টুকরোগুলির মধ্যে কেবলই দেওয়া নেওয়া চলছে ভিতরে-ভিতরে।

এই বহুধার কথা ভেবে স্পেণ্ডার তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন এক সময়ে: আমার আমি মস্ত কোনো মানুষ নয়। নানা দুর্বলতায় চিহ্নিত সে, খেতে ব'সে খেপে ওঠে হয়তো-বা, রেগে যায় কোনো প্রতিবাদ শুনলে, মাছ ধরাই তার একমাত্র আনন্দ আর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো তার ভুলে যাওয়া। কিন্তু এই সবের মাঝখানে তার আছে একজন কেন্দ্রীয় আমি:

> To advance from friends to the composite self
> Central 'I' is surrounded by 'I eating'
> 'I loving' 'I angry' 'I excreting'—
> And the 'great I' planted in him
> Has nothing to do with all these!

স্পেণ্ডারের এই composite self বা central I-কে নাম দেওয়া যাক আত্মগত আমি। আর তাকে ঘিরে আছে তার যে প্রত্যহের ব্যবহারিক ছিন্ন পরিচয়—I eating I loving I angry—সে হলো এক ব্যক্তিগত আমি। ব্যক্তিগত আমি থেকেই বিন্দু বিন্দু নির্যাস পেয়ে তৈরি হয়ে ওঠে কারো আত্মগত আমি। কিন্তু এই আত্ম কি ওই সমাহারটুকু মাত্র? সে কি পাল্টাচ্ছে না কোনো পরিণতির দিকে? যেটা ego, তারও আছে পরিণতি—বলেছিলেন ফ্রয়েড। সেই পরিণতি বা পরিবর্তন ঘটছে কিসের টানে? কোন্ আকর্ষণে? তার ভিতরে আরো কি পূর্ণতর কোনো আমি-র বোধ জেগে আছে, সম্পূর্ণতার কোনো বোধ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলবেন হয়তো 'বড়ো-আমি'? আর সেইটেই কি নয় স্পেণ্ডারের 'great I'?

এক প্রান্তে এই বড়ো আমি, এক প্রান্তে ব্যক্তিগত আমি: এর মাঝখানে রইল আমাদের ক্রমজায়মান আত্মগত পরিচয়। রোম্যান্টিক কবিতায়, বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস পর্যন্ত, আমরা কেবল দেখতে পাই এই

Subiectve I, এই আত্মগত আমিরই মুদ্রা। ব্যক্তির প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই নিশ্চয় তৈরি হয়ে উঠছে এই আত্ম, কিন্তু কবিতায় প্রকাশের মুহূর্তে এই ব্যক্তির চিহ্ন যায় মুছে, সে কেবল গোপনে গোপনে কাজ ক'রে যায় উৎসে। কখনো কখনো, মধুসূদন বা বিহারীলালে যেমন, ব্যক্তি থেকে আত্মে আসাযাওয়ার এই জোড়া চিহ্নটা অবশ্য থেকেই যায়, কবিতা খানিকটা বিহ্বল আর ভাবালু হয়ে পড়ে অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন জুড়ে এত পরিচ্ছন্নভাবে রচনা করলেন এই আত্মজগৎ, জোড়ের চিহ্নটা এমন সুষমায় মিলিয়ে গেল সেখানে যে তাঁর পরে আত্মগত উচ্চারণের এই স্বভাব থেকে নিষ্ক্রমণই হয়ে উঠল উত্তরকালীন কবিদের একটা বড়ো কাজ।

রোম্যান্টিকতার প্রতিবাদ হিসেবে তাই নৈরাত্ম্য রীতিকেই কেউ কেউ মনে করেছিলেন আধুনিকতার প্রধানতম পরিচয়। এই নৈরাত্ম্য রীতির ইশ্‌তেহার তৈরি করেছিলেন একদিন এলিয়ট তাঁর 'ঐতিহ্য আর ব্যক্তিগত প্রতিভা' প্রবন্ধে, আর তার পর চোদ্দ বছরের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ—এমনকী রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা এর উচ্চারণ শুনতে পেলাম আবার। 'বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী' এই প্রশ্নের উত্তর বললেন রবীন্দ্রনাথ: 'বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা'। নিরাসক্ত মনই যে কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন, এই ইঙ্গিত তিনি পাচ্ছিলেন তাঁর তরুণ কবিবন্ধুদের মনোভঙ্গি থেকে, ১৯৩০ সালেই 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিলেন যে 'কবির সম্মান এইটুকু, তার মর্যাদা এইখানে যে মানুষের অনন্ত সন্ধিৎসা তার কণ্ঠে ভাষা পায়···বোধহয় এই অর্থেই ই. এম. ফর্স্টার সকল মহৎ আর্টকে নৈরাত্ম্য বলেছেন।' অথবা আরো পরে, 'মনুষ্যধর্ম' প্রবন্ধে আরো স্পষ্ট তাঁর ঘোষণা: 'আমার বিশ্বাস নৈরাত্ম্যরীতিতেই বিশ্বসাহিত্যের ঐক্যসূত্র অনুসন্ধানীয়।'

নিজের কবিতায় এই রীতির অর্জন সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে খুব সহজ হয় নি অবশ্য। তাঁর কবিতা থেকেই তাঁর কাব্যতত্ত্বের এই বিশ্বাস জেগে ওঠে নি সহজে, তাঁর কাব্যতত্ত্বকে খুব ধীরে অনুসরণ করেছে তাঁর কবিতা। কীভাবে নিজেকে তিনি গ'ড়ে তুলছিলেন অল্পে অল্পে, তার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে আসে, তাঁর কবিতাবইগুলির ধরন লক্ষ করলে। প্রকাশের কাল হিসেবে 'অর্কেস্ট্রা'র দুবছরের অনুজা 'ক্রন্দসী', তারও তিন বছর পরে 'উত্তরফাল্গুনী'।

কিন্তু সকলেই নিশ্চয় জানেন যে এ তিনটি বইয়ের অন্তর্গত কবিতাগুলিতে ঠিক এমনই কোনো কালপরম্পরা নেই, ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে লেখা রচনাগুলিকে এ-তিনটি বইতে ইচ্ছেমতো কবি সাজিয়ে নিয়েছিলেন। কালপরম্পরা যদি নেই, তাহলে কোন্ সূত্রে, কোন ইচ্ছেয় গ্রথিত হলো এক-একটি খণ্ডের রচনাবলী?

সেই সূত্রসন্ধানে এগিয়ে এলে আমরা দেখতে পাই, 'অর্কেস্ট্রা' বা 'উত্তরফাল্গুনী'তে আছে এক অলজ্জ প্রগল্‌ভ যৌবন, কবির আত্মগত প্রেমানুভবের নিবিড় প্রকাশ। এ-দুটি বইতে যে আমি, সে-আমির সঙ্গে কোন বিরোধ নেই রোম্যান্টিক আত্মপ্রকাশের, মর্মে মর্মে একজন রোম্যান্টিকের মতোই এখানে বলতে পারেন তিনি: 'আমারে তুমি ভালোবাসো না বলে / দুঃখ আমি অবশ্যই পাই / কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে / তা ছাড়া কোনো যাতনা জ্বালা নাই!' অথবা, 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে / আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।'

কিন্তু এই একই আমি কি 'ক্রন্দসী'র'ও নায়ক? 'ক্রন্দসী'র প্রথম কবিতাটিতেই দেখা দিয়েছে এক নৈরাত্ম্য আমির পরিচয়, কবির আত্মগত চরিত্র এখানে মুছে গিয়েছে তাঁর বিশ্বগত অস্তিত্বে, ইতিহাসের পটে দাঁড়িয়ে এখানে আমরা এই শতাব্দীর যে-কোনো মানুষের আর্ত ভাবনা শুনতে পাই: 'আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি? / কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে? / কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি / ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।' প্রসিদ্ধ এই 'উটপাখি' কবিতার শেষ মুহূর্তে যখন কবি বলেন, তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে / তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি'—তখন এই আমিতুমি প্রথাগত কোনো আমিতুমি রইল না আর যে-কোনো মানুষের নির্মীয়মাণ ব্যক্তিত্বের দুই বিরোধী টুকরো এই আমি আর তুমি।

নিজের ভালোবাসার সঙ্গে সভ্যতার সংকটকে সুধীন্দ্রনাথ মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন একদিন সংবর্তে পৌঁছে। এই কাব্যে পৌঁছে তাঁর কাব্যতত্ত্ব এক ধরনের চরিতার্থতা পেল, আত্মকে নৈরাত্ম্যের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো তাঁর 'নান্দীমুখ' বা 'সংবর্তের' মতো রচনায়। 'তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে / বসেছি বিজনে নব নীপবনে / পুষ্পিত তৃণদলে': এই পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে একেবারে রবীন্দ্রজগৎ থেকে নেমে আসা যেন, ছন্দে শব্দে

এমনকী ভাব-ভাবনাতেও। কিন্তু এর চতুর্থ স্তবক পর্যন্ত এগোতে এগোতে আমরা কখন অগোচরে সরে আসি সেই ভূমি থেকে, দেখা দেয় নতুন এক অচেনা মুখ যেখানে 'স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন / অথচ তাদের চিনি।' ফলত মিলে যায় কবিপ্রিয়া আর পৃথিবীর মুখ যেমন অনায়াসে তা মিলে যেতে পারত পাবলো নেরুদা বা নাজিম হিকমত বা লুই আরাগঁ-র কবিতায়।

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য ইতিহাসে পৌঁছেও ইতিহাসে আশ্রয় পান নি কোনো। চারদিকে তাকিয়ে কেবলই মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীনকে দেখে তিনি কিসের উপর ভর করবেন, ঠিক করতে পারেন নি তা, কেননা স্তালিনকে তিনি সাব্যস্ত করেছিলেন হিটলারের সুহৃদ। তাই তাঁর গলায় বেজে ওঠে: 'সহেনা সহেনা আর জনতার জঘন্য মিতালি' আর এই জনতা থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নেবার আয়োজনে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক আমি কোনো সঙ্ঘসমীপে যেতে চায় না কখনো, 'আমি' হয়ে ওঠে না আমরা। কিন্তু তখন, আরেকজন কবি, যিনি বলেছিলেন, সাহিত্যের উপজীব্য শূন্যে ঝোলানো নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব নয়, যিনি দেখতে পান কী করে সমাজ ও ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বাশ্রয়ী সম্বন্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্বরূপ মর্যাদা পায়, সেই বিষ্ণু দে'র কবিতায় আমি উঠে আসে বহুবচনের সমগ্রতায়। বিষ্ণু দে বা সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে কেবলই কথা বলেন সঙ্ঘের আয়তনকে সামনে রেখে কোনো পাঠক সেই তথ্য নিশ্চয় এড়িয়ে যেতে পারেন না আজ। 'আমাদের সত্তা শত অশ্বত্থতলার বুলির বাতাসে নিত্য ঝুরু ঝুরু / ভয় পাই খাড়াই চূড়ায় গহন জঙ্গলে তেপান্তরে / ভয় পাই মনের মুক্তিতে': এ হলো বিষ্ণু দে'র দেখা আমাদের দীনতার ছায়া, আর সেই দীনতা থেকে মুক্তির আভাসও তিনি তৈরি করে রাখেন যখন বলেন: 'আমাদের সেতু ওপারে ওপারে / দুইতটে আমাদের স্রোত জলে স্থলে আকাশে উদ্ভিদে···'। মনে পড়বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রায় যে কোনো লাইনে: 'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি' অথবা 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।' কেউ যেন না মনে করেন যে আমি বলতে চাইছি, 'আমি' শব্দটি কখনোই আসে না এঁদের রচনায়। বরং বলা যায় যে প্রায়ই আসে তা, কিন্তু সে-আমি কবির কোনো আত্মগত আমি নয়, সে-আমি দাঁড়িয়ে আছে বিরাট আমরা-র মোহনায়, এঁদের রচনা প'ড়ে নিজেকে আমরা সকলের সঙ্গে হাত মেলানোর ভঙ্গিতেই দেখতে পাই যেন। কখনো কখনো সংশয় আসে হয়তো, কখনো কখনো প্রয়োজন হয় নিজেকে বিচার করে দেখবার, 'আমরা' দিয়েই যিনি শুরু করেছিলেন সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কেও একবার নিজের সমগ্র জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিতে হয় তাঁর 'কাল মধুমাস' নামের দীর্ঘ আত্মজৈবনিক রচনাটিতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনতা-সঙ্ঘের এই পরম নির্ভর সরে যায় না তাঁদের অস্তিত্ব থেকে আর এরই মধ্যে দিয়ে বাঙলা কবিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এক নৈরাত্ম্যরীতির সিদ্ধি।

আমি ভুলিনি জীবনানন্দের কথা। ভুলিনি যে এরই পাশাপাশি জীবনানন্দ বহন ক'রে চলছিলেন এক নিঃসঙ্গ আমিকে, রোম্যান্টিকতারই সম্প্রসারণ হিসেবে। ভুলি নি যে এই জীবনানন্দ যখন তাঁর প্রথম পর্বে 'আমি'কে সরিয়ে নিয়ে 'আমরা' বলেন কখনো কখনো, তার সঙ্গে মৌলিক ভিন্নতা আছে বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রার্থিত বহুবচনের। যখন কবি বলেন: 'আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো' অথবা 'আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নীচে লাল লাল ফল পড়ে আছে 'তখন তাঁর নিশ্বাস' বিষ্ণু দে'র সঙ্গে তুলনীয় নয় একেবারে। বিষ্ণুদের কবিতায় আমি'ও আসে 'আমরা'র আভা নিয়ে, আর জীবনানন্দের এই প্রথম পর্যায়ের রচনাগুলিতে তাঁর 'আমরা'র পিছনে থেকে যায় এক 'আমির'ই অন্তঃসার। এ হলো নিভৃত অভিজ্ঞতার নির্যাস, সকলের চোখে দেখা নয় আর, এ হলো তেমনি ক'রে দেখা যার প্রসঙ্গে ব্লেক বলতে পারতেন যে চোখদুটি হলো শুধু জানালার মতো! ঠিক। কিন্তু ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে জীবনানন্দেরও ছিল একটা পরিণতির টান। ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে সময়ের প্রবল তাড়নায় এই জীবনানন্দেরও স্বর পালটাচ্ছিল, অন্য এক আমির আবির্ভাব তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতাবলীতে দুর্লক্ষ্য নয় খুব। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় যখন তিনি বলেন: 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ/সৃষ্টির মনের কথা আমাদেরই আন্তরিকতাতে/ আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা/খুঁজে আনা' অথবা 'বেলা অবেলা কাল-বেলা'র প্রায় যে-কোনো কবিতায়: 'আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হৈমন্ত সৈকতে/বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সংকল্পের তরঙ্গ কঙ্কাল'—তখন এই 'আমাদের' উচ্চারণের মধ্যে এক আত্ম-উত্তীর্ণ আমিকে দেখতে পাই, হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে যিনি এবার একেবারে এই শতাব্দীর উপর নিশ্চিত ভর নিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু যেসব কিশোর জেগে উঠছিল এই সময়টা জুড়ে, আন্দোলন মন্বন্তর দাঙ্গার মধ্য দিয়ে নবীন অভিজ্ঞতা জমছিল যেসব কিশোরের, স্বাধীনতার পরের মুহূর্তে যাদের শুনতেই হলো 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'-এর ধ্বনি, গ'ড়ে উঠবার মুখেই সম্পূর্ণ বিস্রস্ত এক হিংস্র সমাজ যারা দেখতে পেল তাদের চারদিকে, তাদের পক্ষে ততটা সহজ ছিল না ওই ভর, ওই বিশ্বাস। গোটা পৃথিবী একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, সে তা দেখছে। কিন্তু কিসের জন্য, কী নিয়ে এই যুদ্ধ তা সে জানে না ভালো। নতুন নতুন রাজনৈতিক মতবাদ আর তার প্রয়োগ তার চোখের সামনে ঘটছে, কিন্তু এর থেকে মেলে না কোনো সত্যের আশ্বাস। সে দেখে তার চারপাশে মনীষীদের কথায় আর আচরণে নেই কোনো বিবাহ-বন্ধন, 'সত্য শব্দের নেই কোনো স্পষ্ট মূল্য। তাহলে কি সে আবার ফিরে যাবে তার আত্মমুক্তিতে, আত্মসন্ধানে? কিন্তু সেখানেও তার ভয়। 'দি ব্রাদার্স কারামাজফ্'-এ ডস্টয়েভ্স্কি যেমন লিখেছিলেন যে মানুষ তার সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে বরং নির্বাচন করে নেবে স্বস্তি, মৃত্যু। এই মৃত্যুই তার চারদিকে ঝেঁপে এল তখন। স্বাধীনতার আছে মস্ত দায়িত্ব, নিজেকে গ'ড়ে তুলবার অধ্যবসায়ী আয়োজন, কিন্তু এই শক্তিও যেন হারিয়ে যাচ্ছে তার। তাই তখন, নতুন যুগের তরুণ কবিরা মরীয়া হয়ে ঝাঁপ দেন আরেক 'আমি'র স্রোতে। ভাবেন, সেইখানে তাঁর মুক্তি। এ কোনো নির্বিশেষ আমি নয় আর, এ কোনো আত্মগত আমি নয়, এ হলো একেবারেই ব্যক্তিগত, সম্পূর্ণ এক আত্মজৈবনিক আমি।

'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু' আজ তাই সহজেই হয়ে উঠতে পারে তারাপদ রায়ের কবিতাবইয়ের নাম। এ যে কেবল চমক লাগানোর ছল মাত্র, তা ভাবলে ভুল হবে। কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটাকেই এখন টেনে আনতে চান তাঁর রচনার বৃত্তে। আর, কেবল এই বইটি মাত্র নয়, অনেকেই নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে এই পনেরো বছরের কবিতাচর্চায় কী ভাবে বারে বারেই কবির নাম চ'লে আসে তাঁর রচনায়। মধ্যযুগীয় কবিতায় ভনিতা দেবার ধরন এ নয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা বা উপন্যাসের নায়ক যদি কখনো কখনো নামতই সুনীল হয়ে ওঠে তো বুঝতে হবে যে অস্থিমজ্জাসুদ্ধ সেই চেনা মানুষটিকেই সুনীল টেনে আনতে চান তাঁর সৃষ্টিতে এবার। 'শহরতলীতে আর কতদিন থাকবে অলোক' বলে ওঠেন অলোকরঞ্জন, অথবা নির্দ্বিধায় লেখেন তিনি: 'মানুষ গেলে নামের খনি / আমার পরে এই ধরণী / সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা'।

কারো কি আপত্তি উঠছে এই ভেবে যে এ তো কখনো কখনো শুনেছি আমরা একশো বছরের পুরোনো রচনাতেও? নিজেকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন হুইটম্যানও এই উদ্ধত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 'Walt Whitman am I'! অথবা রবীন্দ্রনাথেরও কবিতার শেষ পর্বে কখনো কখনো কবি যে উচ্চারণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিনাম, সেই তথ্য কি গণনীয় নয় এখানে? স্মরণীয় বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই নামোচ্চারণের সঙ্গে ভিন্নতা আছে সাম্প্রতিক কবির আত্মবিবৃতির। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নিজেকে বিশ্বজগতের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত করবার আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বিত হয়ে উঠছিল হুইটম্যানের দীর্ঘ প্রসারণময় কবিতাপঙক্তিগুলিতে, আর তার সঙ্গে হুইটম্যান দেখেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বেরও এক মস্ত উত্থান, সীমাবদ্ধ ছোটো মানুষের সমস্ত পরিমাপকে ছাপিয়ে ওঠে সেই বিপুল আবির্ভাব: a Kosmos, a mighty Manhattan the son! এই হুইটম্যান জানেন যে তিনি মৃত্যুহীন, তিনি বিশ্বরূপ। যে রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণ করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্ত্যদিনের রচনাগুলিতে, তারও আছে এক সংগঠিত কবিরূপ, একটা আদর্শ প্রতিমার গলায় গিয়ে পৌঁছয় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি সেই মালা। কিন্তু গিন্স্বার্গের নয় ওই সংগঠিত বিপুলতা, একশো বছরের পরের আমেরিকায় হুইটম্যানের উলটো পিঠ তিনি। ক্ষুধার্ত নগ্ন উন্মাদ ধ্বস্ত এক জেনারেশনকে সামনে রেখে তাঁর ক্রুদ্ধ চিৎকার, তাঁর Howl তাঁর পরাভবের গর্জন। উইলিয়ম কার্লস উইলিয়ম্স্ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এই কবির সঙ্গে এই ব'লে যে অ্যালেন গিন্স্বার্গের ব্যক্তিগত ভয়ংকর অভিজ্ঞতাই হলো তাঁর Howl-এর একমাত্র বিষয়। 'Hold back the edges of your gowns, Ladies, we are going through hell' এই সাবধানবাণী তখন বলতে হয় উইলিয়ম্স্কে।

আমাদের দেশের এই তরুণ কবিরাও তেমনি এক নরকের অভিজ্ঞতাকে উত্তীর্ণ হয়ে আসছেন, বলছেন 'এ জীবন সজ্ঞানে, আত্মত্যাগে নয়, সর্বগ্রাসে, সর্বভুক কবিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে', রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এক উলটো দিক হয়ে উঠছেন তাঁরা। সেখানে এই আক্ষেপ উঠে আসে সরাসরি: 'আমি কী রকম ভাব বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ।' একে কি বলব নার্সি-

সিজম কেবল? হয়তো খানিকটা তাই, কিন্তু এ নার্সিসিজম কেবল নিজেকে ভালোবাসারই নয়, নিজেকে ধিক্কারেরও। 'এই যে আবার তারাপদ, কী খবর, পথ ভুলে' এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে হয়তো কবির মনে প'ড়ে যায় যে তাঁর 'একেক দিন ভালোবাসার জন্যে দুঃখ হয় / একেকদিন ভালো না বাসার জন্যে দুঃখ হয় / একেকদিন কোনো বন্ধু নেই বলে / একেকদিন কোনো শত্রু নেই বলে / একেকদিন প্রশংসা শুনি নি তাই / নিন্দাও শুনি নি তাই / একেকদিন খুব দুঃখ হয়।' এই দিনগুলি গড়িয়ে যায় বছরে, কবি এক-এক বছরের হিসেব ক'রে দেখেন তাঁর মনের মধ্যে, কতটুকু পাওয়া হলো এই পৃথিবীতে তার বড়ো বাস্তব হিসেব: 'কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখে নি!' এই কবির আঠাশ বছরে শুনেছি আমরা আঠাশের কবিতা, তেত্রিশে তেত্রিশের। এ নয় সুকান্তর 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ'-ধরনের নির্বিশেষ আবেগ, অথবা রবীন্দ্রনাথ বা গোয়টে আঠারো বছর বয়সে যে তাঁদের চারদিকেই দেখছিলেন আঠারোর সমারোহ সেই উদ্‌বেলতাও এ নয়। এর মধ্যে আছে ঠাণ্ডা মাথার গণিত, পরিসংখ্যান, অভিমান। আর এই অভিমানের গাঢ়তায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কোনো কবি কবিতা লিখতে শুরু ক'রেই ব'লে ওঠেন 'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে!' জীবনের ভুলে তবে কি মৃত্যুই প্রসব করেছেন মাতা: এই জিজ্ঞাসা নিয়ে নিজের জীবনটাকে উলটে পালটে দেখতে চান এই কবিরা, আর তখন, এই দেখতে চাওয়া থেকেই তৈরি হয় তাঁর কয়েকটি সত্তার লড়াই।

পশ্চিমী একজন মনস্তাত্ত্বিক তাঁর এক রোগীর বর্ণনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে সে নিজের মধ্যে আরেকজনকে অনুভব করতে পারে। সেই রোগী, মনস্তাত্ত্বিক বলছেন, ঘুমভাঙার পর একদিন স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল যে তার শরীরটা শুয়ে আছে তার পাশে। এ কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়। মনোবিজ্ঞানে হয়তো বলবে যে তার মনের অহং জেগে উঠেছে তখন, জাগে নি তখনো শরীরের অহং। মানুষের মধ্যে এই রহস্যের সম্ভাবনা তাহলে থেকেই যাচ্ছে, তাই আজ আর নিশ্চয় আমরা চমকে উঠব না যদি Notes from the Underground এর মধ্যে ডস্টয়েভস্কি বলেন: 'জানো, আমি স্পষ্ট টের পাই যে ভিতরে-ভিতরে আমি দুখানা হয়ে আছি। ঠিক যেন কারো দ্বিতীয় সত্তা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার নিজেরই পাশে।'

নিজের পাশে নিজেরই এই ছায়া নিয়ে হেঁটে যাবার অভিজ্ঞতা কেবলই ঘটছে আজকের কবির। আভাস ছিল জীবনানন্দেই: 'আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে / আমি থামি, সেও থেমে যায়'—জীবনানন্দের বোধের মধ্যে আমরা লক্ষ করেছি এই দ্বিধাছিন্নতা, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রধানত তিনি ভর করতে চেয়েছেন তাঁর ভিতরকার জীবনে। আর আজ, সুনীলের মতো কোনো কবি কখনো কখনো বিনিময় করে নিতে চান এই দুই সত্তার, তিনি নিজে আর তাঁর চরিত্র নিখিলেশ পরস্পর ভূমিকা বদল করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছয় যখন দুয়ের মধ্যে ভিন্নতা আর ধরতে পারি না আমরা। অথবা, এ রকমই এক আত্মবিচ্ছেদের মত্ততা থেকে তৈরি হয়ে ওঠে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই টলমলে লাইনগুলি: 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ, ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে।'

বড়োরা রাগ করেন। রাগ করবার যে কোনো কারণ নেই তা নয়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'মনুষ্যধর্ম' প্রবন্ধে সপরিতাপে বলেছিলেন: 'অগত্যা কাব্য আজ খামখেয়ালী; কবির স্বকীয়তা এখন শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারের ভেক পড়েছে; ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে সম্প্রতি আঁকড়ে ধরেছে হিংস্র ব্যক্তিবাদকে।' 'আমি স্বেচ্ছাচারী' ব'লে যে কবিতাটি শুরু করেছিলেন শক্তি, সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অবশ্য তার অনেক আগেই লেখা। এটা ঠিক যে এই ধরনের উৎক্ষেপের মধ্যে আছে একটা শিশুসুলভ অসহায়তা, আছে ব্যক্তিস্বরূপের অপনোদন। বোঝা যায় কেন মারিত্যাঁর নজির টেনে বিষ্ণু দে-কে বলতে হয়েছিল যে গত দশবারো বছরের বাঙলা কবিতার আধুনিকতাকে মনে হতে পারে 'বয়ঃসন্ধিশোভন; নিজেকে নিয়ে ভিত্তিহীন নাটকীয়তার লোভ'। হয়তো বয়ঃসন্ধিশোভন; কিন্তু মনে রাখা ভালো যে একেবারে ভিত্তিহীন নয় এই নাটকীয়তা, যদি একে নিউরোসিস ব'লেও বর্ণনা করেন কেউ তো তাঁকে জানতে হবে যে সমাজ আর ব্যক্তির সাম্প্রতিক অসম সংঘর্ষেই অনিবার্যভাবে তৈরি হচ্ছে এই বিরতিহীন আত্মনাট্য।

ভয়ের কারণ থাকত, যদি এইখানেই সম্পূর্ণ হতো সাম্প্রতিক রচনার পরিচয়। কিন্তু যদি আমরা মনে রাখি যে নিজেকে নিয়ে এই খেলা করার মধ্য দিয়ে, নিজেকে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে ক্রমে কবি গ'ড়ে তুলছেন তাঁর একটা ব্যক্তিত্ব; যদি এই হয় যে ব্যক্তিত্ব কোনো পূর্বনির্ধারিত স্থাণু বস্তু

নয়, ক্রমশ তা গ'ড়ে উঠছে কবির অবিরাম সচেতন আয়োজনে—তাহলে আর ভাবনার তত কারণ থাকে না। 'ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া আর কোনো কিছুই আমার সম্বল নেই—সাহিত্যের কাছে আমি অসহায়। একথা বলেছেন বটে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথায়। কিন্তু এরই পাশাপাশি মনে রাখতে হয় যে 'আমার নাকি বয়েস বাড়ছে' এই সহাস্য বিলাপ করতে করতেও এ-কবিকে আজ জানাতে হয় যে 'যে লেখে সে আমি নয় / যে লেখে সে আমি নয়।' এইরকমই বলেছিলেন কদিন আগে বুদ্ধদেব বসু—যে বুদ্ধদেব বসু অনেকদিন আগে থেকে ঈষৎ পরিমাণে ভর করতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত আমির উপর—'এই যাকে আমি বলি 'আমি' / সে / কে? সে নিত্য বিদায় বলে, স্বাগত জানায়!' এই নিত্য বিদায় আর নিত্য স্বাগতের মধ্যে গ'ড়ে উঠতে থাকেন একজন কবি। তখন তাঁর ব্যক্তিবিবরণও ক্রমে হয়ে উঠতে থাকে তির্যক, আর অলোকরঞ্জন তাই লেখেন তাঁর আত্মকথায়: 'আত্মবিবরণী অথবা আদর্শ বিবৃতির পথে না গিয়ে পাঠকের সঙ্গে আমি আড়াআড়ি অথচ নিবিড় আত্মীয়তা চেয়েছি।'

আবার তবে দেখা দিচ্ছে এই আড়াআড়ি সম্পর্কের আভাস। একদিন কবিতার কাছে দাবি করা হয়েছে যে সে বদলে দেবে সভ্যতার মুখশ্রী, কবির দায়িত্ব প্রায় যেন সন্তের, নেতার। কিন্তু আজ আর সেই দায়িত্বের উঁচু মঞ্চে নন তিনি। আজ তিনি সকলের সঙ্গে পথে চলেছেন হেঁটে, সকলেরই দিকে সহজভাবে চোখে চোখে তাকান তিনি, সকলেরই আকাঙ্ক্ষা বা দীনতার সমভাক্ তিনি—কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর কবিতা হয়ে উঠছে তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করে তুলবার আয়োজন মাত্র, এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছনো তার কাছে এক আমি থেকে আরেক আমিতে পৌঁছনোর মতোই তাৎপর্যময়। আজ সেই আমিত্বের নির্মাণে কোনো কিছুরই থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন না তিনি, সমস্ত নিয়ে তাঁর চলা, সবকিছুতেই তাঁর টান, যেমন শক্তি লেখেন: যেতে যেতে এক একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক তখনই ছেড়ে যাওয়া সব / আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব / হয়তো তুমি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না—শুধু যাওয়া / যাত্রী তুমি, পথেবিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে / এই তো চাই, বিচার বিশ্লেষণ তোমার নয় / তোমার নয় কূটকচাল, টানাপোড়েন, সর্বজননীন মৌতাত, রাধেশ্যাম / যাত্রী তুমি—পথেবিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে / এই তো চাই॥

শামশের আনোয়ার
হেসে ওঠে রাশিয়া

১

আমাকে চারিপাশ থেকে ঘিরে ধরে প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাল্লুকেরা—
তাদের মোটা স্তন এবং ভুঁড়ি;
উঁচু, ক্ষুধার্ত, হিংস্র এবং পিপাসু দাঁত হেসে ওঠে আমার
অসহায়তা লক্ষ্য করে—
হেসে ওঠে রাশিয়া!
উল্টে যাওয়া, চরিত্রহীন চোখ আমাকে বলে আমারই
লজ্জা এবং অধঃপতনের কথা।
ছোট্ট পাথর; তুমি ঘুরপাক খাও।
হায়! আমার চোখ এবং শরীর হাজার হাজার টুকরো
হয়ে ব্যর্থ, খর্খরে হাওয়ায় উড়তে থাকে।

২

আছাড় মারো, নিজেকে ধরে আছাড়
মারো জীবনের পাটাতনে!
দাঁতের সিংহাসনের ওপর আছাড় মারো
ভাঙো কোমর এবং পাঁজরের হাড়;
খুঁজে বেড়াবার মতো সর্বস্ব দুটি হাত
ভেঙে চুরমার হয়।
আছাড় মেরে ভাঙো প্রেম, টেলিফোন……
আছাড় মেরে ভাঙো ডাক্তারের বাড়ি, হাসপাতাল, ওষুধের
দোকান এবং স্টেথিস্কোপ।
ভাঙো; হায়! নিজের মুণ্ডও ভাঙো।
বুকের আঁধার সিঁড়ি জড়িয়ে ধরে কেন তুমি বসে আছো
হে ঘাতক—অনুতপ্ত ঘাতক?
যাকে তুমি ভাঙো সে যে আগেই ভেঙেছে নিজেকে।

৩

আমার ডান ঘাড়ের ওপর কেঁপে ওঠে গিলোটিনের
দিগন্তবিস্তৃত ক্ষুর—

বাঁ ঘাড়ের কাছাকাছি সারাক্ষণ মিলিটারিদের
কুচকাওয়াজ চলে।
খোপা রমণীরা বারবার নিয়ে যায় আমার আত্মা
এবং দেহ।
তবু এ, ইউ, সিতে প্রত্যেক শনিবার আলোচনা
হয় কবিতা নিয়ে।
আমি চীৎকার করে বলি: "হায়; আমাদের কিছু নেই
অসুখ ব্যতীত।
আলোচনা বন্ধ করো—
এসো, আমরা বরং নাচি আর কাঁদি;
নাচি আর কাঁদি আর হাত পা ছুঁড়ে কেবল
ডিগবাজি খাই।"

কি গ্রীষ্ম আর কি বসন্ত

এখন শীতে কেঁপে উঠছি আমি যদিও বাইরে
পুড়ে যাচ্ছে গ্রীষ্ম;
আমার সারাক্ষণই শীত লাগে কি গ্রীষ্ম আর কি বসন্ত!
হু হু মুখাগ্নি করে আমি দাঁড়িয়ে থাকি লাঠি হাতে
নিজেরই চিতার পাশে—
অথবা যে কোদালে আমার কবর খোঁড়া হবে সেই
সেই কোদালখানি শিয়রের কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকি।
মণিবন্ধে ঘুরে বেড়ায় অসুস্থ, ক্ষিপ্ত ইঁদুর—
টিকটোয়েন্টি খাওয়া ঐ হাঁ মুখ ইঁদুরের শেষ
কষ্ট, তার বুকের ধুকপুকানি ছড়িয়ে পড়ে আমারও
শিরাউপশিরায়, হাতের নাড়ীর ভিতর।
ফলে আমি সারাক্ষণই কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়াই
কি শীত আর কি বসন্ত!
সারাক্ষণ অথর্ব ট্রাম, কুঁজো বাস হাজার হাজার
মানুষকে পৌঁছে দেয় অফিসে, আদালতে, য়ুনিভার্সিটিতে:
আসলে পৌঁছে দেয় ঐ মৃত, বিশাল ইঁদুরের অস্পষ্ট, ভ্যাপসা
গন্ধের কাছাকাছি।

মর্মান্তিক ক্লিপ অবধি

আমার ইচ্ছা হয় কলমটাকে পেটের ভিতর বসিয়ে
দিই আমূল,—বন্ধ,—যেখানে স্ত্রীলোকেরা ধারণ
করে ভ্রূণ কিংবা যে হৃদয়ের ভিতর থাকে
স্বামীর প্রতি ভালোবাসা।
আমার ইচ্ছা হয় কলমের নিব ঠুকে বসিয়ে
দিই জিভের ওপর;
সংখ্যাহীন যা নাড়িয়ে নাড়িয়ে পৃথিবীর মানুষেরা কথা বলে।
অথবা কপালের ভিতর ঢুকিয়ে বিদ্ধ করি মগজ—
যে চোখ দিয়ে মানুষ তাকায় ও বিচার করে
ইচ্ছা হয় সেই চোখের ভিতর মর্মান্তিক, ক্লিপ অবধি
ঢুকিয়ে দিই আমার কলম।

দিলীপ কুমার বসু

কবিতাবলী

'তাকে যদি বিসর্জন বলে মনে হয়,
জেনো তা গর্জন হতে পারে।' এই বলে গুরু
পাইপগান বিতরণ জ্যোৎস্নায় করলেন শুরু।
ছায়া ছায়া লক্ষ নির্বিবেকী
শান্ত্রী এসে ঘিরে ফেলল মাঠ।
জ্যোৎস্নায় দেমালে রাইফেল
হরিণের শৃঙ্গে পাইপগান
অন্ধকারে থ্যাবড়ামুখো বীভৎস কামান।

সারারাত
জলাশয়ে শিশির পড়ছে
কোনো হরিণের রক্ত।

সামন্ততান্ত্রিক মাঠে ঔপনিবেশিক গাড়ী, এক গাড়ী চাঁপা
কবির বিয়েতে যাবে, ইতিমধ্যে কবি চাপা পড়েছে গাড়ীতে,
মেয়েটি বুলেট খেয়ে দমদমে পড়ে আছে, ভরপেটে নড়া
সম্ভব হচ্ছে না মোটে, বরযাত্রী জমা হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়িতে।

'তুমি মোরে করেছ নক্সাল' বলে এক শালা সেও কাব্য লেখে,
উলঙ্গ উন্মাদ পায়ে চলে আসে চায়ের আড্ডায় ;
সভ্যতাই মিথ্যা ব'লে অসভ্যতা কবিতায় করে,
ঘুষি নেড়ে ফ্যাসীবাদী হয়ে গিয়ে বক্সারের দিকে চলে যায়।

সামন্ততান্ত্রিক মাঠে ঔপনিবেশিক গাড়ী হাজারে হাজারে
কবিতায় আবেদনপত্রসহ চাকরি খোঁজে আনন্দবাজারে।
চাকরি থেকে তাদের ফেরালে,
যুগান্তর সুনিশ্চিত, ঠেকানো যাবে না।

কনটেম্পোরারী ছবি শ্বশুরেরা তুলবে তাই
এই বিবাহের একটা 'শট' নেয় ;
শট্-ডেডমেয়েটির স্তনাগ্রচূড়ায় রাখে চাঁপার স্তবক
চাপা হাসি খিক্‌খিক্ শান্ত্রীগুলো হাসে আর ক্লিক্‌ক্লিক্ ক্যামেরাক
শট ; তৈরি সন্ত্রাসের বুলেটের 'স্টিললাইফ',
এমন কি মৃতদেহ 'স্টিললাইফ' করে।

সুব্রত রুদ্র
চিঠি

বাড়ি থেকে কোথাও যাই না ;
দু-চারজনের সঙ্গে এই একটু কথাবার্তা, কখনো
সন্ধেবেলা মাঠে গিয়ে বসি, হাওয়ায়
শান্ত তাঁর খেয়াল মাঝা-মাঝি, বুঝি
কোন অভিযোগ নেই ;
আমাদের ঝগড়া, কূটতর্ক ঠিক তেমনিই···

আমি বাড়িতেই থাকি, একদিন আসুন।

অনন্য রায়
দুটি সনেট

১. বীতস্কন্ধ হাইড্র্যাক্টে প'ড়ে থাকে নষ্ট আলপিন
পর্যুদস্ত স্বপ্নরশ্মি ইতস্তত স্মৃতিতে বিলীন
মৃত পায়রার মতো স্তব্ধ শ্বেত হিম নিঃসঙ্গতা
দাঁতালো হাওয়ার মধ্যে ওড়ে যেন উচ্ছিষ্ট নির্মোক

বেড়ালের কালো চোখে ইন্দ্রধনু বর্ণাঢ্য রঙিন
বিচ্ছুরিত বিদ্যুতের মতো তবু ত্রিকোণ তীক্ষ্ণতা
আকাশ-সমুদ্রে ঢেউয়ে প্রস্ফুটিত তারার ভ্রূলতা
গীর্জার ঘণ্টার ধ্বনি হ'য়ে জলে মূঢ় অর্বাচীন

যেন মৃত্যু ; ভয়ার্ত আদরণীয় মরচে-পড়া নখ
বহুকোণিক জ্যোৎস্নায় শিকারীর গুলি ও হরিণ
একাকার ; হাইড্র্যাক্টে বহুলাঙ্গ ইস্পাতের চোখ
জেগে দ্যাখে—সারারাত চাঁদের আহার স্যাকারিন !

গাছের মসৃণ ছায়া ঘাসে, যেন কফির চামচ।
ডিমের ভেতর মৃত্যু করে স্ফীত প্রজন্মের খোঁজ ॥

২. কিসমিস-বাদাম আনা হ'য়েছিলো বিধাতার মৃত্যুর পরেই
অথবা বৃত্তের দিকে ধাবমান তীর যেন ক্যাণ্ডিনস্কির—
আমাকে ধরতে পারে সহসা পুলিস অন্ধকারে নিয়তির
বজ্রাহত হবো আমি প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের নিভৃত ঘরেই
সাপের ছোবল ছাড়া মুহূর্তে বাঁচিনা কেন ন্যাজ ও ধার্মিক
তৈলচিত্র নই আমি, জন্ম ও যেমন তেমনি মৃত্যুও সার্বিক

আত্মময় যুগ্মতায় যদি ঘটে দ্বৈত-আলোড়ন স্বাভাবিক
হয়তো তবেই পেতে পারি স্বপ্ন কিমাকার বহুবাচনিক

মাতাল মাতাল আমি খুঁজি বিশ্বাসের ভিত ; অপ্রত্যাশিত
আমাকে ধরতে পারে অন্ধকারে সহসা পুলিশ নিয়তির
নেশাচ্ছন্ন চোখে দেখি কিম্ভূত বিশ্বকে এই দীনতাব্যতীত
মাতাল মাতাল আমি অন্বিষ্ট আমার ছুঁচ, আলোড়িত ভিড়

জনতায় মিশে গিয়ে আবার এসেছি ফিরে শূন্যতার ঘরে—
দেখেছি কেমন ক'রে মানুষেরা বেঁচে থাকে—জন্মায়—মরে ॥

স্নেহাশিস্ শুকুল

বোধি

বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আমি বাস ছেড়ে যায় ঠিকসময়
রাত বাড়লে একলা ভাবি শেষ বাস ধরব না হয়
ঘুমোন গে যান, শুভরাত্রি, মন্ত্রমুগ্ধ আমি যাত্রী
লাস্ট স্টপেজে নেমেই বুঝি এই হল ঠিক নামার সময়

পুত্রেষ্টি

আমাকে একদিনের জন্য জ্বলে উঠতে দাও কামদেব
আমাকে একদিনের জন্য অভিজ্ঞ করে দাও কয়েকটি বিশেষ কামকলায়
সারারাতে আজও বারান্দায় গেলে পুত্রের প্রয়োজনে বড় একা একা দেখায়

বাগদত্তা

কদাচিৎ তুমি বলো পুতুল পুতুল খেলবে, নামমাত্র সত্ব
আলপিন ফুটিয়ে কনিষ্ঠায় রক্ত দিয়ে লিখবো আমন্ত্রণ পত্র
সারাদিন শুয়ে থাকবে পুতুলের ঘরে, তৈরী হবে ঠাসবুনোন পুতুলের জামা
আমিতো বুঝি না বাগদত্তা, আমার জন্যই দেওয়ালে টাঙাও নতুন কেনা
আয়না।

ধূর্জটি চন্দ

কবি ও কবিতা

প্রতিষ্ঠা বলতে তুমি সর্পভ্রমে রজ্জু জেনেছিলে
জেনেছো গোপন হতে, জনারণ্যে না আঁচিয়ে মুখ
শুধু ধীর স্থির এক অমৃত আবাসে থেকে থেকে
নিজের বিরুদ্ধে তুমি করে যাও আমৃত্যু লড়াই।
কেন এত তড়িৎ তুমি বুঝে নিলে উষ্ণ আত্মীয়তা
মানুষ তো তোমার নিকট এসেছিল, দিয়েছিলে প্রেম
ভালবেসেছিলে তুমি লতাগুল্ম মনুষ্যহৃদয়
কেন তবে সরে থাকা ? অহংবোধ, আত্মাভিমানে ?
প্রগাঢ় প্রেমিক তুমি হতে চাও, তাই কি সৃজনে
এত বেশী মগ্নতা, নারীকেও ঠেলে দাও দূরে ?
যে তোমার কাছে থাকে সেকি শুধু পিতৃত্ব, দায়
লুব্ধ ঠোঁট, মখমল, অহংযূ সন্তান প্রতিমা ?

তাহলে যা তাকে নিয়ে ধীর স্থির অমৃত আবাসে
প্রতিষ্ঠা তো তোর নয়, কেননা এ সভ্যতা জানিস্
মানুষ করেছে সৃষ্টি এটা ঠিক, কিন্তু যে মানুষ
তার কর্ণস্কন্ধ কাটা, যজ্ঞভয়ে ভীত নয় সে-যে।

রুনুর দু' হাত

শূন্য তক্তপোষ থেকে শব্দ করে ওঠে কোন্ বাঘ ?
সেখানে মলিন নামে কেউ ছিল একদা প্রত্যহ,
উজ্জ্বল ধরেছে ঘাড়, ভেঙ্গে ফেলে আসবাব যেমন
সহজে কিশোর এসে লাথি ছুঁড়ে বলে—'চাঁদ কই' ?
এই দীপ্র শোণিতাক্ত কামা দিন তড়িৎ এসেছে
বাঘের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তক্তপোষ থেকে শ্রুত হয়
হাড়ের ধ্রুপদী গান, মানে শৌর্য্য, সদাশিব মানো :

শূন্য তক্তপোষ শুধু পেতে চায় রুনুর দু' হাত ॥

মজার পদ্য

গোড়ালি জড়িয়ে দেখি কল্মীলতা রয়ে গেছে আজো
বড় প্রিয় ছিল উহা, মনে পড়ে আমাদের রুনু
রান্না-বান্না জানিত না, তথাপি সে আন্তরিক ছিল
কথায় কথায় যেন কল্মীকথা গুণগান করে
অনবদ্য চুমু খেত, আমি জানি অদ্যাবধি শুধু
মাত্র তিনবার খেয়ে কল্মী নয় রুনুর আঘ্রাণ
জিভ থেকে ক্রমে ক্রমে উরুতক্ যতটা পেরেছি
বয়ে নিয়ে গেছি আমি, অহো রুনু, চুক্ চুক্ চুক্।
গোড়ালি জড়িয়ে দেখি আজো ঠিক সাপের মতন
ফোঁসফাঁস করে যায় আমাদের কলকাতা বুঝি,
কল্মীলতা সঙ্গে নিয়ে, আমি, রুনু, এবং কলকাতা
মিলিয়ে মিশিয়ে দেখি, সমার্থক, সব রুনুময়

কে বলেছে পি. সি. ছিল ইন্দ্রজালে অবাক্ প্রতিভা
রুনু কি তাঁহার বুকে কোনোদিন রাখে নাই হাত?

মজার পদ্য

রুনুর দুই-পা দেখি। আর নয় আর কিছু নয়,
আর সব মেঘে ঢাকা, মেঘ শব্দে সুপ্রাচীন গান
ভেসে আসে গুহা হতে, লাভাসূর্য, চকমকি, খিলান
প্রস্তরপ্রহরী আসে, যেন টানে সভাকক্ষে তার
রুনুর দুই পা বেয়ে নেমে যাই, বাহারে বাহার
শ্বেতশুভ্র ফুল ঐ ফুটে ওঠে পর্বতপ্রমাণ
রুনুর দুইপা শুধু, নয় নয়, সকলি প্রকট
ঐ তো তুষারপ্রতিম সিংহীর বিনম্র চোখ
আনত অহংবোধে, মেঘ সরে, সরে কি ও মেঘ
গান থেমে আসে যেন, হিমশাদা ফুল ঝরে যায়
রুনুর দুই পা নয়, সবই মূর্ত, শ্বেত বিছানায়॥

তুষার চৌধুরী

গঞ্জিকা প্রবাহ

এই কেশোদ্গমহীন শিশুঅংগ নারীর ছিল না
ভোরের বারান্দা জুড়ে এক ঝাঁক খুশিস্নগ্ধ পায়রার পা
ঘরের ভেতর একটা বুড়ো নেশাখোর যার ত্রিকাল প্রপঞ্চ
তার ঘরে ছায়া নয় মৌমাছির খাদ্য আছে শিশির সেবনদ্রব্য আছে
কিন্তু সে কেমন প্রাণী—একচক্ষু—সত্য জানে সৌজন্যও জানে
কেমন স্বর্গের ভীরু গন্ধনুড়ি পিঁপড়ের শৈশব
দন্ত বিকশিত হলো বহুকাল চেপে রাখা বাতাসের লিপি

কোনদিন যদি তার নীল গন্ধরাজের কাছে দুঃখ পায় নক্ষত্র মাধবী
অকস্মাৎ স্বপ্ন ও আত্মার ধ্বনি উন্মাদ সমুদ্রে মাংসফুল
দূরবর্তী বোধিসঙ্ঘে তার যাওয়া কিংবা যাত্রা শুভ হোক বেশ্যার সমাজে
দুঃসাহসী রাজহাঁস চুমু খায় উরু ও কুন্তলে মায়া প্রসূতির মত
আমার ভ্রমণ থাক নৈশ বাতাসের কাছে ঋণী

২

১ কে কাকে ইজারা দিচ্ছে নোনাপুকুরের জল মাছ শ্যাওলাঘাট
ওখানে নেমেছে চাঁদ সন্দেহজনক এক মেয়ে তার আযৌন নিয়তি
পেছনে পেছনে যার ভুক্তভোগী ক্রীড়নক অনুগামী টর্চ ও হৃদয়

২ রেবতীর যোনি মাংসে ছাতিমফুলের গন্ধ অর্থাৎ ছাতিমগাছ কাছে
পিঠে কোথাও ছিল কি
এরকম চিন্তা থেকে সম্মোহিত হয়ে পড়ি আদ্যঋতু দর্শনের পর
যেমনি বালিকার হয়
পোশাকের পদধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর প্রশ্ন আসে : ওই কি বিছানা

৩ ওটাই পিপুল বৃক্ষ, ওকেই অর্জুন গাছ বলে
ওকে নীল গুহ্যছিদ্র বলে ওকে সমুদ্রের নাব্যতা বলে না

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বনদেবতা

পাতা-ঝরে পড়া বনের মধ্যে ঘুরছ একাকী ;
তোমার দুই-পা হলুদ পাতায় ঢেকে দিয়ে গেছে।
ঢেকে দিল নাকি ইচ্ছেকে আজ বাইরে আসার !
পাতা-ঝরে-পড়া বনের মধ্যে ঘুরছ একাকী।
আমার কথা কি মনেও পড়ে না, কাউকেই আর মনেও পড়ে না ?

একলা এখন দুহাতে ওড়াও চ্যুত পাতারাশি—পাতার হলুদ
তোমার দুইপা আরো টেনে নিক
আরো টেনে নিক বনের দেবতা।

রাত্রিতে যখন

রাত্রিতে যখন গোটা বাড়ি চুপচাপ, জানলার কাঠ, ইট ও পেরেক,
তখনই কথা বলে গাছের সঙ্গে গাছের শিকড় ; ল্যাম্পপোস্ট ঘেরা মাটি—
নির্জনতায় চুপচাপ রহস্যময় কাঠের দরজা জানলা শিক,
তখনই তাদের গোপন বাক্যালাপ ; দরজা জানলা ঘেরা সার সার সাদা ঘুণ—
তোমার অদ্ভুত ভালো লাগে ; অদ্ভুত লাগে, একলা একটা গোটা রাত
জেগে কাটাতে !
নর্দমার ভিতর দিয়ে জলের সন্তর্পণ যাওয়া-আসা, কলরবহীন দূরের
স্থির আলো—
তাদেরও কিছু তোমাকে বলার আছে ; দুলতে দুলতে আকাশের নিচে
ঘুমিয়ে পড়ছে এক স্তব্ধ কারাগার,
শরীরের ওপর শরীর, মেঘডাক, বৃষ্টিপাত, ঘাম।

রাত্রিতে যখন গোটা বাড়ি চুপচাপ, তখনই স্তব্ধতার ভাষা কথা বলে—
কথা বলে জ্যোৎস্নায় রেলের বাঁকানো লোহা, সাঁকোর ওপর
ধূ ধূ আকাশের ছায়া॥

স্বর্গের কলরব

গলি থেকে আরো গলি হেঁটে গেছি কতদিন ; গলিতে
রঙিন কাঁচের শিল্পঘেরা বাড়ি-দুপুর-চারপাশ স্তব্ধ হয়ে আছে।
তিনটি কুকুর ও দুজন ভিখিরি আমাকে লক্ষ্য করে ; ডাস্টবিন
পেঁচিয়ে তাদের ছায়া ঠিক ঝানু গোয়েন্দার মতোন,
দুপুর—সমস্ত পথে আয়নার ঝলক, স্ট্রাইকের চেয়েও বেশি ফাঁকা॥
কেউ সাড়া দিয়ে ওঠো ঐসব স্তব্ধ গাঁথনির থেকে, পাঠাও
সংকেত, চিঠি—আমার বুকের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে সাদা ফুল
আমি ছিঁড়ে দেবো সংকেতকারিণীকে ; এখন দু'পাশে' ঘুমোনো দরজার
আরো ভিতরের দিকে কি যেন স্বর্গের কলরব—যতো শুনি ততো
দুচোখ জড়ায় ঘুমে ; গোল ফিতের মতোন কি একটা ঘুরছে আমার
ভিতর।

এমন দুপুরবেলা কতদিন, স্মরণীয় চটি পায়ে হেঁটে গেছি পথে পথে—
পথ থেকে নেমে, পথের ভিতরে নেমে, ভেবেছি কোথায় যাওয়া যায় !
দুপুরে বন্ধুর অফিস—কাঁচের ঠিকরে পড়া গ্লাস, চা, সিগারেট ?
ফাইল থেকে সার সার পোকা উঠে আসে সরকারী আঠার গন্ধে,
লিফটের গুঞ্জন—পথে নেমে পার্কে শিরিষ ছায়ায় কিছুক্ষণ শুয়ে
ট্রামে বাসে ঘুরে ঘুরে যাদবপুর, গড়িয়া বণ্ডেল পথের ওপর থেকে নেমে
পথের গভীরে চলে যাই ; পথ, তারও দেহবল্লরী আছে।

প্রদীপ চন্দ্র বসু

বিদায় উপহার

সেসময়ে শীত ছিল অথবা হেমন্ত ছিল সম্ভাবনাহীন
শূন্য ফসলের ক্ষেতে তোমাদের পদশব্দ চলে গেল দূরে
বিদায় জানাতে এসে হারালো রুমাল, বই, নিরুত্তর স্মৃতি ;
শেষ বিকালের আগে এসেছিলে তুমি নীল সোয়েটার গায়ে
খেয়াল করেনি কেউ, উপহার ঢেকেছিল আমাদের চোখ।

ঘুম

কম্বলের ভাঁজ খুলে সে শুয়ে পড়ে বিছানার ওপর
মেরুদণ্ড টানটান, স্থির চোখ
চেয়ে থাকে মশারীর ছাদে। আরো ঘন হয় রাত
তরল আঁধার বুকে ভেসে যায় জোনাকির আলো।
সারাদিন শিরা ও ধমনী জুড়ে ছিল ক্রুদ্ধ কুকুর
প্রতিবাদে মুখর
এখন হারিয়ে গেছে গভীর অরণ্যে। আকাশের নীচে
সমান্তরাল ঝুলে আছে সে, তার শরীর
শূন্যতায় কেঁপে ওঠে রাতজাগা পাখীর চীৎকারে।

দৃশ্য

চিরিমিরি জঙ্গল পার হলে দেখা যায় মসুন
মোরামের টিলা। সান্তালযুবতী
রোদের কাঁচুলী পরে বসে আছে। হেমন্তের শেষে
আঙ্গুলের নখ ছুঁয়ে উড়ে যায় হিম।
প্রেম তার কাম্য নয়, বিদেশী পথিক
সাবলীল দর্শকের চোখে ছিঁড়ে নেয় স্তনের শিমুল।
বাতাসে মাটির ঘ্রাণ
শূন্যতায় দানা বাঁধে অপরাহ্ন দ্রুত।

সমরেন্দ্র দাস

জলের প্রেমিক

কার ছায়া ঐ পড়ল জলে জল কি তাহা ছাখে?
আমরা সবাই ভাবতে বসি যে যার খুসি ইচ্ছামতো
হয়তো সেসব ভির-ভুকুটি, একেবারেই অসংগত
জলের ভিতর জলধ্বনি পড়ে কি কারও চোখে!

জলের স্বভাব জলই জানে, আমার স্বভাব আমি
ডুব সাঁতারে চিৎসাঁতারে জলকে যখন ডাকি
জল কি তখন হৃদয়টি দেয়? হয়তো সেসব ফাঁকি
আমরা যে যার শিউরে ভাবি জলের প্রেমিক আমিই!

কে সে?

বুকের মধ্যে যখন তখন মাটি কোপায় কে সে?
হাজারটা মুখ ভীড় জমাচ্ছে এই যে মাথার নীচে
বন্ধ দুয়ার চতুর্দিকে, কিংবা শুধুই সামনে—পিছে
শিরার থেকে উপশিরায় রক্তকণা যাচ্ছে কেন বিপুল ত্রাসে
এ-ও কি সেই মায়াবী ফাঁদ ভালোবাসার অমল খিদে
অনুন্নত পাহাড়পথে সাপের বাসা?
এমন তো নয় এইখানেতে প্রথম আসা
শাসন নামক যন্ত্রটিকে দাবিয়ে রাখা প্রবল জিদে
প্রশ্ন তবু ঘুরতে ফিরতে চাবুক হানে
এই কি তোমার নিজস্ব ঘর, দালান-কোঠায় হেঁটে যাওয়া?
শুনতে পাই প্রবলভাবে না বলছে বুকের হাওয়া
এমন তো নয় আমার ভিতর নিত্যি-নোতুন জন্ম-খবর সবাই জানে!

বৃক্ষ—২

সব গাছ দেখে সাধ জাগে, ছুঁয়ে যাই তাদের অন্তর,
আমাদের ভাষা আছে, মুখ আছে, জিহ্বা আছে,
সেসবে কি বঞ্চিত ওরা?
ধ্যানীর মত বসে থাকি তাদের পদপ্রান্তে
দেখে তাদের মন ভেজে
উপহার ক্রোড়ে পড়ে একে একে,
কাকের পালক, ঝাঁটার খিল, আর একটা বাদামের খোসা!

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

'লজ্জাহীন স্তুতি'

ফলওয়ালার জন্য রেখে যাবো টিনভর্তি নষ্ট খোলস
সহিসের জন্য রেখে যাবো শিরদাঁড়া ভেঙে চাবুক

তোমার জন্য রেখে যাবো বেজন্মা বিকলাঙ্গ সন্তান
আর নির্য্যাতিত বিপ্লবীর জন্য……

স্পর্ধা তো কম নয় যুক্তি খুঁজতে যাও,
অকারণেই, অকারণেই, অকারণেই

ফলওয়ালা শিরা নিঙড়ে দিয়েছিলো পানসে নাসপাতি
সহিস চালিয়েছিল রেসের ঘোড়া উচ্চৈশ্রবা বলে
তুমি সেই আগ্নেয় মিনিটে পাঁকাল মাছের মত পিছলে গিয়েছিলে

আর নির্য্যাতিত বিপ্লবীর জন্য
লজ্জাহীন স্তুতি—
"তোমার ফাঁসীর রজ্জু হয়ে উঠুক পঞ্চবটীর লতা।"

অমিতাভ বসু

খচ্চর

আজীবন খচ্চরের সেলাম নিতে নিতে সম্রাট
তিতিবিরক্ত। জলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তিনি
ছাখেন তাঁর ঠোঁট ; বিনীত কুকুরের মত ঝুলে পড়েছে।
একজীবনের অহঙ্কারগুলি কুষ্ঠের মত উঁকি দিচ্ছে
শরীরের অলিগলি থেকে। চমকে ওঠার আগেই
বাম ভুরু কেঁপে ওঠে তাঁর। নিঃশব্দে বিচূর্ণ হয়
ঘৃণা, অতঃপর ভাবলেশহীনতায় ফিরে যান তিনি।
সস্নেহে চিবুক চুম্বন করেন নিজের, তারপর তাঁর
অবদমিত ডানহাতটি শ্লথভাবে টেনে নেয় প্রিয়
পানীয়। শেষবারের মত খচ্চর হতে সাধ যায় তাঁর।

কলকাতা

তোমার উপকণ্ঠে আমি অন্য এক নগর বসাবো। তারপর
স্বেচ্ছায় নির্বাসন দেব তোমাকে, কলকাতা ; তুমি তোমার
দারুণ নিদাঘদগ্ধ শরীর নিয়ে অন্তরীণ থেক।
আমি ঐ ব্যবসা-বাণিজ্যময় দেহ ছুঁয়েও দেখব না

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়

এমন কি ঈশ্বরও ভুলে যান

আজকাল বড়ো হাস্যকর মনে হয় নিজেকে আমার—এই হাত, এই পা
কখনো বা অন্যের বলে ভুল হয়ে যায়
কাল সন্ধেবেলা, হলুদ আলোর নীচে সারাক্ষণ এক রেস্তরাঁর ভেতর
ঈশ্বরের মুখোমুখি আমি—বড়ো হাস্যকর ছিল এমনকি ওই ঈশ্বরও
কখন যে বৃষ্টি এলো—বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ট্রাম, কিছু ব্যস্ত লোক
কতোদিন ভেবেছি, হঠাৎ শার্টপ্যান্টের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে
আমার আত্মা
আমার আত্মা, ৩টে ২৭-এর ট্রেণে চেপে চলে যাবে একদিন খুব ভোরবেলা
আর আমি, চুপচাপ বসে থাকবো হলুদ আলোর নিচে সারাক্ষণ, এক
রেস্তরাঁর ভেতর, এবং ঈশ্বরের মুখোমুখি

পৃথিবীর কোনো এক দিকে, কোনো এক সময়, ঝড় উঠেছিল খুব
দেখি, এখনো আমার চুল উড়ছে ভীষণ—মফস্বলের বাস
চলে যাচ্ছে আরো দূর মফস্বলের ভেতর—একটাই তো পথ খোলা
আছে ওইদিকে
শুধু রোজ সন্ধেবেলা, কোলকাতার ডাক্তারখানাগুলোয় ভিড় জমে উঠছে
মানুষের
আর পৃথিবীর প্রত্যেকটা ডাক্তার, অসুখের ভয়ে, ঘন ঘন দাঁড়াচ্ছে গিয়ে
বিশাল এক আয়নার সামনে
হায়, একটা ছোট ফুস্কুড়িও কীরকম অসম্ভব ভয় ছাখায় তাদের
এইসব বড়ো হাস্যকর—আজকাল বড়ো হাস্যকর মনে হয় নিজেকেও
আমার
এই হাত, এই পা—কখনো বা অন্যের বলে ভুল হয়ে যায়
এমনকি ঈশ্বরও ভুলে যান, মানুষই দিয়েছে তাঁকে মাননীয় প্রধানের গদি।

চশমার ভিতর দিয়ে

চশমার ভিতর দিয়ে যতদূর দেখা যায় তারো বেশী দেখেছি একদা
খালিচোখে—দেখেছি তোমার
নিষ্পত্র গাছের মতো দীর্ঘ জাগরণ, ভয়, দিনান্তবেলার
ম্লান—চোখের পল্লবে
ভারি ঘুম, মানুষের ঘুমের মতন যেন নয়
তোমার উলের বল একদিন তোমার কুরুশকাঁটা একদিন, ছুটে যায়
উঠোন পেরিয়ে
কাচের ভিতর দিয়ে ওই দিকে ভেসে গেছে আমাদের ধর্ম, উপাসনা
খালিচোখে দেখেছি তোমায়
কাঠের মিস্ত্রীর পাশে শুয়ে আছো, কাঠের জীবন, স্থিতি, বাঁকানো
ভ্রূজোড়া
কেঁপে ওঠে নাকি—এই শীত
এবছর সরাসরি আমাদের নমনীয় বুকের উপর উঠে এলো—এই লিপ্ত
শীতে, প্রচ্ছায়ায়
ওভারব্রীজের নিচে থেমে গেল ব্যাণ্ডেললোকাল—বুড়ো বেহালাবাদক
চশমার ভিতর দিয়ে চলে গেল নির্বাসনে—ধর্মতলাজুড়ে
ওই ব্যর্থ ভিখারির শোক, আর তূষের কম্বল ওড়ে, উড়ে উড়ে
ক্লান্ত হয় ফের

চশমার ভিতর দিয়ে যতদূর দেখা যায় তারো বেশী দেখেছি একদা
খালিচোখে—দেখেছি, মানুষ
চামড়ার আড়াল থেকে বাড়িয়েছে হাত ওই কোলকুঁজো রমণীর দিকে
আহা, ওই কাঠের আঙুল, ওই দুঃখী অভিজ্ঞান
পদ্য লেখার আগে ঝরে গেছে তার, আহা, ঝরে গেছে অপরাহ্নে, শীতে
যাবতীয় ছায়াচিত্রমালা

সুজিত বসু
প্রবীণ নরকে

অথর্ব তারই দ্বারে পৌঁছে যাওয়া বারবার, গোলক ধাঁধায়
ঘুরে পরিশ্রান্ত হ'লে তারই কাছে জলপাত্র, যা থেকে তৃষ্ণার
নিবৃত্তির প্রতিকণা ক্রীত হয় পিপাসাকে বর্ধিত করার
পরিবর্তে ; সাজসজ্জা, আভরণ বদলে গেছে রাত্রিতে, সন্ধ্যায়,
আচরণবিধি শুধু চিরন্তন, পলেস্তারা, সুরকি ও প্লাসটার
খ'সে গিয়ে শীর্ণ দেহ, প্রলেপের সঙ্গে ঝ'রে গেছে সব দায় ;
দায়িত্বও ঝ'রে গেছে, লজ্জা, ঘৃণা যা সিদ্ধির পথে অন্তরায় ঃ
ডাকিনী অবাধভাবে ছুঁড়ে দেবে মৃত মাংস, মরা ধূলি আর
সাপের খোলস, হাড়, প্রাচীন অগ্নির কুণ্ডে, বিশ্বাসী পথিক
বশীভূত হ'লে সব পথ যাবে, চ'লে যাবে গতানুগতিক
প্রয়োজনীয়ের দ্বারে, বিনীত হত্যার কাছে, নম্র নিবেদনে
ভিক্ষুক লতার মতো শান্ত পরজীবী হ'য়ে, পণ্য হ'য়ে শোকে ঃ
শোধনাগারের কাছে, কারাগার সন্নিকটে ও সেবাসদনে ;
ঘুরে ফিরে তারই কাছে, অথর্ব তারই দ্বারে, প্রবীণ নরকে।

অংকুর সাহা
যেতে হবে জনহীন

চকমকি পাথরের দীর্ঘস্তূপ প'ড়ে আছে প্রাচীন শহরে
আগুন জ্বালাতে হ'লে পরস্পরে আলাপ করার মতো সন্নিকটে
আসা চাই, খুব বেশী আসন্নতা বিস্ফোরণ এনে দিতে পারে
জলে ও আকাশে ; দেবতার অন্তরালে···ওই তারা, তারাও মানুষ
এসেছিলো রথে চড়ে গম্ভীর আতসে, জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা
পাহাড় সরায় কেন নীল ধমনীর তেজে আমরা জানি না।

ইতিহাস একপেশে, তাই আমাদের চোখে শ্যাওলার বিষ
নিজস্ব দিগন্ত চায় আগেপিছে, ক্রমে অস্পষ্টতা আসে, আরো আসে
পুণ্য পৌরাণিক গান ঃ ঠেলে আনে শৈল্পিকতা, নগ্ন কারিগরি
বিস্ময়ের বৃত্ত আনে ; পাথরের পরিবেশে ধ্বংস, হিমবাহ,
দুষ্পাঠ্য শিলার লিপি অজানিতে রয়ে গেছে, এবং সন্ধানে
যেতে হবে আরো দূরে, জনহীন, ঐ আন্দিজের কাছাকাছি।

গতিশীল স্রোতের বিভবে

আবার বেলুন হ'য়ে ওড়াউড়ি করা চলে, খুব অসংবদ্ধ নয়
সেই খেলা—শরীরের গুরুভার হয়তো কখনো ছিল, এখন তা
স্বপ্নে গদগদ, পলকা পালক মুখে শিয়রের রেণু মেখে
মায়ার নদীতে স্নাতা ; স্বেচ্ছায় শরীর ভেজে বার্তাবাহী জলে
চৈতন্যে সামান্য ফাঁক, টুপটাপ বিন্দুপাত : ফুলতোলা শায়া।

এরই আরেক নাম ঢেউ তোলা বসন্ত বাতাস, যেই মাত্র এসে
রুডি হার্তানোর মতো পাঠাবে শাট্‌ল কক্ ও পাশের কোর্টে ;
আলো দূরে সরে যাবে হলুদ ফোকর দিয়ে, পুনরায়
আসবে নিকটে···আসা-যাওয়া, সহবাস সকলেই বিভ্রান্ত পাথর।
ভেঙেছে জলের দাঁত, স্রোত লম্বালম্বি যায় শূন্যের বিভবে।

শংকর চক্রবর্তী

স্বল্পখিদের ছল

পড়তে হবে ঢের
লিখবো অল্পস্বল্প,
জানতে গিয়ে ফের
ছেলেবেলার গল্প
পড়বে মনে জানি ;
হাতের কানাকানি—
কণ্টিকারির দুর্গ ছেড়ে
শীলবাহিনীর রাণী, কাঁদতে
বসেন পা ছড়িয়ে
অল্প খাওয়ার সর্তে···
রাজা পেলেন হালে পানী—
চলনবড়ন বেড়ে,
বসলেন হাঁটু গেড়ে :
দুর্গে ফিরে গেলেন রাণী
রাজার প্রাসাদ ছেড়ে,
আর রাজার পিঠে চ'ড়ে।

তারপর যায় দিন যায় আর রাত যায়,
তৃপ্ত বপু স্বপ্ন দেখে, জপ করে, ঘুমায় :
রাজার হাতি, রাণীর গোলাম, দাঁড়ি চোরের দল
দুর্গ ঘিরে দেখলো শেষে স্বল্প খিদের ছল॥

উদয়ন ভট্টাচার্য

পতন

সেই তো উষ্ণতার লোভে গিয়েছিলে সন্তর্পণে
চোখ দিয়ে ডেকেছিলে আবার
আমিও তেমন পুরুষ স্মৃতিতেই হেসে উঠতে অপমান হ'ল
চামড়ার নীচে একটু ঝলসালো শুধু মাংস গোপনে

তুমি তো বলেছিলে সম্পর্কের দেওয়ালে ফাটল
অথচ শ্বেতপাথরের মানুষ দেখলেই যে বিনীত হ'লে
তারপর তুমি নারী না পাথর ভেবে ভেবে আকুল

এই তো কেমন সহজ থাকো, ঠাণ্ডা যুদ্ধ, অর্জুন গাছের ছায়া
মানুষের নতুন পোশাকের দিকে সম্ভ্রম জানানো
অনুরোধ ভেঙে চলে যাওয়া অচেনা পুরুষের সঙ্গে
তবু কেন জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভরে গেলে বলো,
চাঁদ বড়ো অবিশ্বাসী মায়াময়
কেন বালকের ভিক্ষাপাত্রে ভরে দাও শুধু স্নেহ
বালকেরা মগ্ন হ'য়ে চলে যায় শূন্যপাত্র নিয়ে

কেন বেলাভূমিতে বলেছিলে
সমুদ্রতীরে লিখে আসবে নাম, একটু ঝড়েই মুছে যাবে চিহ্ন তার
সেই তো মীমাংসার লোভে চোখ নেড়ে জানালে সন্তাষণ
তবে কেন ঘৃণা করে একদিন পাথর ভেঙেছিলে
নারীর সমস্ত শুদ্ধতা নিয়ে কেন বলেছিলে একদিন
প্রাসাদ নয়, তুমি মন্দির ভালোবাসো।

অজয় সেন

আমার জন্যে বর্ণমালা নেই

নির্জন একাকীত্বই তোমাকে খর ও তার্কিক করেছে, তোমার মিতচারী ব্যবহার
ক্রমশঃ বিশ্বস্ত ঋতুর মতো পর্যটন করে বেড়ায় এই বর্ধমানের বাউল গ্রামে,
এই উজ্জ্বল সহর এরই জন্য তোমার দুঃখ—তীব্র রোদের মত জ্যোৎস্নায়
সমস্ত শরীর মেলে বসে আছো—বসে আছো তোমার বন্ধুর চিঠির জন্যে।
এইখানে বসে এঁকেছো অংগহীন বালকের দীর্ঘ অবয়ব—লিখেছো
আবেগময় পঙ্‌ক্তি :—তবে কি তা বেদনা ছিলো ?
শব্দের গভীর থেকে উঠে আসা তীব্র অনুভূতি ?
এই পৃথিবীতেই তোমার জন্যে উঠে সাজানো থাকে সারিসারি বিদ্যাসাগর রচনাবলী ও পশ্চিমের লোকশিল্প—আর এখানেই
আমার চারিদিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাত ও ক্রমবর্ধমান শত্রুতা
আমারই চোখের সামনে মেলে ধরে ওয়ালটেয়ারের মানচিত্র—আজ
হাস্য করোজ্জ্বল তাঁতকলের ভাঁজে সুনিপুণ লুকিয়ে রাখছি আমার দুঃখ, নিঃশব্দ কান্না, আমার অসহায়তা—অথচ
শীতকাল এলো না আমার কাছে, নিজেরই কাছে আমি দোষী হয়ে যাই ;
আমার ভালো লাগেনা বন্ধুত্ব, ছলচাতুরী—আর অই,
নির্জন একাকীত্ব তোমার মত আমারও কাম্য ছিলো,
হায়, আমার জন্যে শীতকাল নেই
হায়, আমার জন্যে বিদ্যাসাগর রচনাবলী নেই ॥

দেবীপদ মুখোপাধ্যায়

পুরনো রেকর্ড

বহুদিন পর আজ পুরনো গ্রামোফোনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে আমার উচ্চাকাঙ্খী বামন ভূত।
দেখি, এখন তোমার সমুৎসুক আঙুললতায় জড়িয়ে আছে সংক্রামক আগুন
এ ভাবেই এনেছো ফাল্গুন ;
ধীবর সমিতি থেকে উপহার এনেছো গোপনে, জালকাঠি, সহাস্য লাটিম !
এভাবেই শ্রমজীবি মানুষ পেয়েছে গুঢ় আফিসের অন্তর্গত মুক্তির উপায়
শোনা যায়,
তোমাদেড় পুরনো রেকর্ডগুলি গত শীতে গিয়েছিল চুরি।

সংক্রমণ

সংক্রমণের সময় এসেছে নাকি ?
বুকের ভিতরে লুব্ধক কোজাগরী
কিছু নয় ওই অলীক মুকুর স্মৃতি
বসন্ত হানে নির্দয় তরবারী।
গোপন যা কিছু হৃদয়ে কায়েমী ছিল
সে কি ভালবাসা ?
চমকে উঠেছে প্রতিষেধকের ছুরি

নিখিল বসু

বোধন

খুব ভয় করে আমার, খুব ভয়
জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে হঠাৎ বাজে শাঁখ
গাছ পাতা আর নরম চুল নুয়ে পড়ে
শিরশিরে হাওয়ায়
পালক উড়ে যায় এপার-ওপার
ব্রিজের ওপর দিয়ে
খুব ভয় করে আমার, খুব ভয়

সুধীর দত্ত

একাদশ দ্বার খুলে

ফসলে গেরুয়া ক্ষীর, আল বাঁধো। অথচ সেখানে
জলের বিপুল বেগ,

শস্যপাত,
ধ্বস নামে পাহাড়ে ফাটলে

ক্রমেই জলের স্রোত বেড়ে ওঠে, স্ফীত হয়, অবয়বহীন
শরীরে কোটাল ডাকে,
ভরা টান, আল ভাঙে, আমার সঞ্চয়

এভাবে উবুড় হয়ে ভেসে গেলে শূন্যঘট, সমূহ উপচার,
একাদশ দ্বার খুলে
তুমি ডাক—আরুণি! আরুণি!

প্রদীপ রায়গুপ্ত
রমণীরা

১. স্বাতীর জন্য

তুমিও এভাবে আরো বড়ো হও নিরুত্তাপ কৈশোরের নদী;
প্লাবনে ভরাও বুক, জ্যোৎস্না থেকে ঠোঁটে স্বাদ তুলে নিও, চোখে
সমুদ্রের নীল মুদ্রা, তারপর মুখ থেকে মুখের ভিতর দিকে
মুখের নিমগ্ন করতল
ভিক্ষাপাত্রে তুলে দিও···ওই যে কিশোর, ওরা
আমাদেরই উত্তরপুরুষ,
একদিন পূর্ণ হ'য়ে শরীরের কাছে এসে তৃষ্ণার অঞ্জলি
পেতে দেবে···

তোমার দিদিকে তুমি ব'লে দিও, সে-ও এক নগরবিহারী
পরিব্রাজকের মতো মমতায় মমতায় লিপ্ত হয়েছিলো,
উদাসীন, খুব উদাসীন···

২. শ্রীপর্ণার জন্য

তার মুখগন্ধ থেকে কিছু ফুটেছিলো ফুল নিবিষ্ট, হলুদ;
আহা প্রেম, আহা আমি সঙ্গোপনে কেন ওই
ব্যক্তিগত প্রজাপতিটির
ছিঁড়েছি বর্ণাঢ্য পাখা···মাংসের ভিতরে সে তো
বিঁধে আছে উদ্ভ্রান্ত বেদনা;
তার নির্জনতা তাকে আরো বেশি নিষ্ঠুর করেছে;
মৃত নারীটির দেহে খুঁজেছি প্রবালকীট, দ্রাক্ষাফল, আরো গাঢ়
মাছের জলজ আঘ্রাণ,
সন্তান চেয়েছি স্বপ্নে···চারিদিকে শান্ত রাত, তবু
বুঝি নি কেমন মৃত্যু দূরে গিয়ে চ'লে আসা, ভালোবাসা, হিম···

চুম্বন চুম্বন ব'লে গাছের পাতায় শুধু কেঁদে উঠেছিলো
শিশিরেরা···

৩. রত্নার জন্য

নিষিদ্ধ পবিত্র তুমি, তোমার মাথায় তাই আমার
হিতৈষী হাত নামে;
মনে মনে যেই বলি তুমি আরো সুখী হও, তখনই কী পাপে
কেঁপে উঠি, নিজেকেও অত্যন্ত সন্দেহ হ'তে থাকে;
নির্বাসন থেকে আমি রক্তাক্ত এসেছি ফিরে, আমি সকলেরই
ছিলাম করুণাপ্রার্থী, অথচ আমাকে কেউ করুণা করে নি···
আমার গলায় তাই জন্তুর পিপাসা জলে, আমি জানি তোমারা প্রেমিক
আমারই বয়সী হবে···তবে কেন তুমি
এমন সাহস করো, হৃদয়ে ঝরাও মেঘ, কুণ্ঠাহীন ভালোবাসা চাও···
অজাচারী বলেছে কি, কেউ কি আমাকে
অজাচারী বলেছিলো? আমি নিজেকেও ঠিক বিশ্বাস করি না;
আমার গলায় জলে জন্তুর পিপাসা, আমি নেমে যেতে চাই
জলাশয়ে···

৪. সুস্মিতার জন্য

তোমার শরীর শুধু মনে পড়ে রেখাহীন···মুখ, সে তো কবে
শ্যাওলায় গিয়েছে ঢেকে, মনে রাখবার মতো অহংকার
আমারো কি ছিলো?
তোমার চিকন কেশে এখনো জড়িয়ে আছে শীতার্ত দিনের
তরুণ প্রণয়লিপি, বাসনার ছিন্নপত্র···একদিন শব্দময় পায়ে

জলের গহন দিকে গিয়েছিলে স্মৃতিহীন, তবু আজ ফেরাতে পারো না
আমার প্রথম সেই যৌবনের মোহকাল···এখন অজাতশ্মশ্রু নই···

অথচ তোমার জন্য একদা মন্দিরে গেছি, নারী-ঈশ্বরের
পর্যাপ্ত যৌনতা-ভরা দিনগুলি মুছে গিয়ে আজ শুধু ভেসে ওঠে নীল
শৈবালে আচ্ছন্ন এক কীর্ণ মুখ···

সোমক দাশ

ভ্রমণে মরণে

চূর্ণযৌবনা ছিন্ন পরিধেয় শরীরে শুধু রাখে অভ্যাসে
পৃথিবী জেনে যায় রূপের মগ্নতা অতর্কিতে গেছে দূরবাসে
এখন শুধু আছে দীর্ঘ ঘূরপথ ভ্রমণ ভরে থাকে আলস্যে
এখন শীতরোদে দগ্ধ অস্থির মথিত নিঃসার স্থির ভাসে
এখন প্রিয়জন চতুর ব্যস্ততা ত্বরিত ছলনায় মেলে হাসে
চকিতে আসে যায় স্বপ্নযৌবনা উতলরাত্রির স্মৃতিভাষে

চিহ্নময়তার সকল খেলা আজ মরণ বিপ্রপ শর হানে
গুহার মলিনতা কখন মুছে দেয় অমল শিলালিপি উপেক্ষায়
প্রপাত নিনাদের অদূরে কেঁপে ওঠে স্নিগ্ধ হরিণীর ত্রস্ত বুক
কিভাবে জেনে যায় ব্যাধের ক্ষিপ্রতা দয়িত নয়নের প্রেম আনে
চপল উপহাসে স্বচ্ছনির্ঝর সহজচঞ্চল গীতিমালায়
ক্ষণিক উচ্ছাসে অলীক আয়োজনে পূর্ণ হয়ে ওঠে তুচ্ছ সুখ

ছিন্নবসনার অলস ভ্রমণের ক্লিন্নকালশেষে বধিরমৃত্যু
গভীর মমতায় কেমন মুছে দেবে অর্ধে ক্লান্তির কূল পাথার

রবীন্দ্রনাথ

পাগল ছিল খাঁচার মধ্যে একলা বন্দী দুহাত শূন্যে তুলে
জীবন ছিল খাঁচার বাইরে পাগল দেখত সবাই কেমন সুখী
পাগল যেন একলা ভাবত আসলে আমিই এঁকেছি সেই চোখ
যেখানে সব ফোকলা দাঁত একটু পঙ্গু মানুষ হেরে গেছে
আসল কথা জানাই হয়নি খাঁচার চাবি হারিয়ে গেছে তাই
পাগল শুধু একলা বলবে একটি চোখ তাকিয়ে আছে ঠায়
হাজার দুঃখ পেরিয়ে যাবো তবুও এই চোখের বাইরে আমার মরণ নাই।

সর্পবৃত্তান্ত

পৃথিবী সর্পময় হয়ে যাবে
সব স্থলভাগে কিলবিল করে উঠবে সাপের পাহাড়
এরকম ঠিকঠাক ছিল
তারপর
'আত্মজের স্বাদ খুব সুমধুর'
প্রসূতিসর্পের দিকে এই তথ্য ছুঁড়ে দিল কেউ
পৃথিবী সর্পময় হল না

অসুখের অরণ্যদেব

একা অরণ্যদেব জানলা দিয়ে তোমার ঘরে আসে, শেষরাত্রে, বাইরে জ্যোৎস্না
প্রায় মরামাছের চোখের মতন রঙ তার
সেই অদ্ভুত আলোয় অরণ্যদেবের মহান শরীর বড় রহস্যময় হয়ে যায়
তোমার কষ্টার্জিত ঘুম অনাকাঙ্ক্ষিত ভেঙে যায়, তুমি শুনতে পাও
বজ্রের মত কণ্ঠস্বর
"বেশ্যাকে শেখাতে চেয়েছিলে বিপ্লবের রাজনীতি, সে কি অনুতাপে,
তীব্র ক্ষোভে?"

অনিচ্ছায়, অথচ অনায়াসে, প্রথমরাত্রের কথা তোমার মনে পড়ে,
তখন বোধহয় জ্যোৎস্না ছিল না
কিংবা তুমি নজর করোনি ; তখন তোমার কামহীন ভ্রমণ ছিল বেশ্যাপল্লীতে
মদ্যপের মতো
তুমি তো মাতাল নও, তবে কেন মাতালের মত নারীমাংসের দিকে
গিয়েছিলে, অথচ দেখেছো
তিনহাজার অতৃপ্ত চোখ মাংসের নিচে জেগে আছে

তারপর, সেই শেষরাত্রের অদ্ভুত আলোয় তোমার মনে হল, ধুস—
অরণ্যদেব জানলা দিয়ে ঢুকতেই পারে না, দরজা তো বন্ধই ॥

শামশের আনোয়ার

সেই কবি, যাঁর এই ভীতিবিহ্বল দর্পণটি
বাংলাভাষার পাঠক দেখতে চাননি।
হয়ত কবিও নন। স্বর্গীয় বালক,
সর্বস্বের মূল্যে যে রজনীগন্ধা, জ্যোৎস্না ও
বাঁশির স্বপ্ন দেখেছিলো, এই বাংলাভাষার
হৃদয় অবধি তার বাঁদিকের
রক্ত গোলাপ ছুঁয়ে আছে।

মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে

প্রকাশিত হল। দাম ঃ তিনটাকা
সুবর্ণরেখা

অভিজাত সাহিত্যের বিশেষ সংগ্রহ
ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থাদির
সমাবেশ ক্রেতা রসিক-পাঠকের কাছে
আমাদের অপরিহার্য করে তুলেছে

বুক য়্যাণ্ড ফটো ষ্টোর্স
১৬, গড়িয়া হাটা রোড। কলকাতা-১৯

এই সংখ্যা বুদ্ধদেব বসু সোলঝেনিৎসিন রবি সেন এবং
অন্যায় যুদ্ধে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তিনি : বুদ্ধদেব বসু / শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তাঁর সংগে আমাদের সম্পর্কে ছিলোনা জটিলতা
তিনি খুব সোজা করে দেখাতেন কিভাবে বাড়ির
বাহিরে পা দেবে, আর ঘুরে আসবে বাড়ির ভিতরে
তাঁর সংগে আমাদের সম্পর্কে ছিলোনা জটিলতা।

কিন্তু, একদিন তাঁকে কীরকম অচেনা বোধ হলো—
হয়তো হেমন্ত তাঁকে ছুঁয়ে গেছে, মন ভালো নেই…
এরকম নিচু স্বরে কথা তিনি কন নি কখনো
হয়তো হেমন্ত তাঁকে ছুঁয়ে গেছে, মন ভালো নেই…

অন্ধযুগ, দ্বিতীয় সংকলন, বৈশাখ, ১৩৮১
প্রচ্ছদচিত্র : পাব্‌লো পিকাসো
সম্পাদক : পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
দাম : দেড় টাকা

ছেপেছেন সত্যপ্রসন্ন দত্ত, প্রাচী প্রেস, ৩২ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা-৯
প্রকাশ করেছেন, সম্পাদক, ১৩/সি ঘোষ লেন, কলকাতা-৬,
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : অমি প্রেস।

এই পত্রিকা পড়ে আপনার ভাল লাগলে, কোনো কিছুর
বিনিময় প্রত্যাশা না করে আমাদের অর্থসাহায্য করুন।